ইসলাম ও বিজ্ঞান

প্রথম খণ্ড



ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

ইসলাম ও বিজ্ঞান

প্রথম খণ্ড

রচনাঃ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

ইন্টারনেট সংস্করণ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

গবেষণা বিভাগ

আলী সেন্টার, সিলেট, বাংলাদেশ।

engineerazizulbari@gmail.com

✲✲✲✲ বিষয়সূচী ✲✲✲✲

প্রথম খণ্ড	১-১৪০
ভূমিকা	১৭
জ্ঞান আহরণের উপায় ও কারণ	১৭-৩৪
ইতিহাসের আলোকে বিজ্ঞান	৩৫-১২৬
পরিচ্ছেদ ১	৩৫-৪১
সৃষ্ট জগত, মানুষ ও বিজ্ঞান	৩৫
প্রাচীন যুগে বিজ্ঞান	৩৬
গ্রীক বিজ্ঞান	৩৭
আলেকজান্দ্রিয়ায় বিজ্ঞানচর্চা	৩৯
ভারতীয় বিজ্ঞান	৪১
পরিচ্ছেদ ২	৪২-১০৪
মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞানচর্চা	৪২
জাবির ইবনে হাইয়ানের কার্যকাল	৪৫
ইসলামী গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা, ইব্রাহিম আল ফজরী	৪৬
ইয়াকুব ইবনে তারিক	৪৬
আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আল-ফজরী	৪৭
মাশাল্লাহ	৪৭
জবির ইবনে হাইয়ান	৪৮
আল-খোওয়ারিজমির যুগ, আল-মামুন	৫০
আল-কিন্দি	৫১
ইসলামী গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান	৫২
আল-হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, আল-আব্বাস ইবনে সাঈদ	৫৩
আবু সাঈদ আদ-দারীর, আল-খোওয়ারিজমি	৫৩
সহল আল-তাবারি	৫৪
আহমদ আল-নাহাওয়ান্দিম হাবাশ আল-হাসিব	৫৫
ইসলামী চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ঔষধবিজ্ঞান, ইবনে শাহদা	৫৫
জিব্রিল ইবনে বাখতিসু	৫৫

সালমাওয়াই ইবনে বুয়ান, ইবনে মাসাওয়াই	৫৬
আর-রাজির যুগ, আল-মাহানি	৫৭
আহমদ ইবনে ইউসুফ আল-মিশরী	৫৭
আন-নাইরিজি, তাবিত ইবনে কুররা, ইউসুফ আল-খুরী	৫৮
হামিদ ইবনে আলী, সবুর ইবনে সহল	৫৯
ইয়াহইয়া ইবনে সারাফিন	৫৯
আর-রাজি, হুনাইন ইবনে ইসহাক	৬০
কুস্তা ইবনে লুকা আল-বালাবাক্কি, জাবির ইবনে সিনান	৬১
আল-বাতানি	৬১
আবু বকর	৬২
আল-মাসুদের সময়, ইবনে আল-আদমী	৬৩
ইবনে আমাজুর	৬৪
আবু কামিল	৬৪
আবু উসমান	৬৪
আল-বলখী	৬৫
ইব্রাহিম ইবনে সিনান	৬৫
আল-ইমরানী	৬৬
ইবনে ওয়াসিয়া	৬৬
ইসহাক আল-ইসরাঈলী	৬৬
আবু-ই-ওয়াফার যুগ	৬৮
মুতাহহার ইবনে তাহির	৬৮
আবু জাফর আল-খাজিম	৬৮
নাফিজ ইবনে ইয়েমনী	৬৯
আবুল ফাতহা	৬৯
আল-কুহী	৬৯
আল-সিজ্জি	৭০
আব্দুর রাহমান আস-সুফী আর-রাজি	৭০
ইবনে আল-আলম	৭০
আস-সাগানি	৭১
আবু ওয়াফা	৭১
আল-খুজানদি	৭১

আবু নাসির	৭২
মাসলামা ইবনে আহমদ	৭২
আল-ক্বাবিছি	৭২
রাবি ইবনে জায়িদ আল-উসকোফ, আহমদ আত-তাবারি	৭৩
আলী ইবনে আব্বাস আল-মাজুসি (ম্যাজিয়ান)	৭৩
আল-কুমরী	৭৪
আবু সাহল আল-মাসিহি	৭৪
আবু মানসুর মুওয়াফ্‌ফাক ইবনে আলী আল-হারাই	৭৫
আল-তামিমি	৭৫
আল-বালাদি, হাসদাই ইবনে সাপরুত	৭৬
ইবনে সাদ আল-কাতিব আল-কুরতুবি	৭৭
আল-বিরুনির সময়, আবুল কাসিম আজ-জাহরাবি	৭৮
আবু রায়হান মুহাম্মদ আল-বিরুনি	৮০
আবু আলী আল-হুসেইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা	৮৩
আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে ইয়াহইয়া আল-জারক্বালী	৮৬
উমর খৈয়ামের যুগ, উমর খৈয়াম	৮৮
ইমাম আবু হামিদ আল-গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি	৯০
আবু মারওয়ান আব্দুল মালিক ইবনে জোহর	৯৩
আল-ইদ্রিসী	৯৪
আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে রুশদ	৯৬
নুরুদ্দীন ইবনে ইসহাক আল-বিরতুজী, ইবনে খালদুন	৯৯
মুহাম্মদ তারগাই উলুগ বেগ	১০৩
পরিচ্ছেদ ৩	১০৫- ১২২
মুসলিম স্পেনে বিজ্ঞানচর্চা, ঐতিহাসিক সত্য	১০৫
ইতিহাসের পাতা থেকে	১০৬
আন্দলুচিয়ায় মুসলিম জ্ঞানচর্চা	১০৮
আব্বাস ইবনে ফিরনাস	১০৯
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর গবেষণা	১১০
অঙ্ক ও জ্যোতির্বিদ্যা	১১২
মেডিসিন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে মৌলিক অবদান	১১৪

ভূগোল শাস্ত্রের উপর স্পেনিশ মুসলমানদের অবদান ১১৮

পরিচ্ছেদ ৪ ১২৩-১২৮
ইসলামী স্বর্ণযুগের পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ১২৩
আধুনিক বিজ্ঞানের উত্তান ১২৪

পরিচ্ছেদ ৫ ১২৯-১৪০
উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দি ১২৯
প্রাণীবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রে উন্নয়ন ১৩১
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ১৩৪
বিংশ শতাব্দির বিজ্ঞান ১৩৫
বিংশ শতকে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বিশ্বতত্ত্ব ১৩৭
পৃথিবী নিয়ে গবেষণা, চলমান তথ্যবিপ্লব ১৩৮
এ খণ্ডের শেষ কথা ১৪০

দ্বিতীয় খণ্ড ১৪১-৩৪০
আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ভূমিকা ১৪২

পরিচ্ছেদ ১ ১৪৪-১৫৫
অণু থেকে মহাবিশ্ব ঃ বস্তুজগত ১৪৪
অণু বা এটম ১৪৪
অণুর আধুনিক মডেল ১৪৬
আধুনিক এটমিক থিওরীর ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ ১৪৭
রাদারফোর্ড মডেল ১৪৯
বোর মডেল, নিউক্লিয়াস ১৫০
নিউক্লিয়ার ফোর্স এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ১৫২
ফিশন রিয়েকশন ১৫৩
সংক্ষেপে অণু ১৫৪

পরিচ্ছেদ ২ ১৫৬-১৬৪
অণু থেকে বস্তু, মলিকিউল কিভাবে গড়ে উঠে ১৫৬
ইলেমেন্ট (মৌলিক পদার্থ) ও কম্পাউণ্ড (যুক্ত পদার্থ) ১৫৮

ইলেমেন্ট	১৫৮
ইলেমেন্টের পিরিওডিক টেবিল	১৫৯
পিরিওডিক টেবিলের গ্রুপ	১৬০
কম্পাউণ্ড বা যুক্ত পদার্থ	১৬২
স্বভাবে বস্তুর ৪টি অবস্থা, বস্তুর সারসংক্ষেপ	১৬৩
পরিচ্ছেদ ৩	১৬৫-১৫৮
বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত মহাবিশ্ব	১৬৫
প্রাকৃতিক চারটি ফোর্স	১৬৫
মহাকর্ষ বা মধ্যাকর্ষণ	১৬৬
মহাকর্ষের আধুনিক থিওরী	১৬৭
দুর্বল আনবিক শক্তি (উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স)	১৬৯
সবল আনবিক শক্তি (ষ্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স)	১৭০
বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয় শক্তি (ইলেকট্রমেগন্যাটিক ফোর্স)	১৭০
মহাবিশ্ব	১৭১
পরিচ্ছেদ ৪	১৭২-২০৪
জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বিশ্বতত্ত্ব	১৭২
আমাদের সৌরজগৎ	১৭৩
সূর্য	১৭৪
কাল্পনিক স্পেইসশীপে মহাবিশ্ব ভ্রমণে	১৭৫
বুধ	১৭৮
শুক্র	১৮০
পৃথিবী ও চন্দ্র	১৮১
মঙ্গল	১৮৩
আষ্ট্ররয়েড বেল্ট বা গ্রহাণুপুঞ্জ	১৮৫
বৃহস্পতি	১৮৬
শনিগ্রহ	১৮৮
ইউরেনাস	১৯০
নেপচুন	১৯১
প্লুটো	১৯২

উল্কা বা কমেট ১৯৩
আন্তঃতারা মহাশূন্য ১৯৫
আন্তঃগ্যালাকটিক মহাশূন্য, মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি ১৯৭
মেজেলানিক ক্লাউড্স ১৯৯
লকেল গ্রুপ বা আমাদের নিজস্ব স্থানীয় গুচ্ছ ২০০
ভারগো গ্রুপ ২০০
কমা গ্রুপ ২০১
তারা কাষ্টার, নেব্যুলা ২০২

পরিচ্ছেদ ৫ ২০৫-২২২
বিশ্বের গঠনপ্রণালী, আয়তন ও জন্মবৃত্তান্ত ২০৫
কজমোলজি ২০৭
কজমোলজিক্যাল থিওরী ২০৮
মহাবিস্ফোরণ থিওরী ২০৯
জগতের মৃত্যু ২১৫
তারার মৃত্যু ২১৭
ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গর্ত ২২০
লাইট ইয়ার বা আলোক বৎসর ২২১

পরিচ্ছেদ ৬ ২২৩-২৩৫
আপেক্ষিকতাবাদ বা রিলেটিভিটি থিওরী ২২৩
বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ ২২৫
মহাকর্ষ সমতাবাদ ও স্থান-কাল বাঁকাকরণ ২২৬
জেনারেল রিলেটিভিটি বা সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ২২৮
টাইম ডিলে বা সময় লম্বিত হওয়া ২২৯
ডপলার এফেক্ট ২৩৩

পরিচ্ছেদ ৭ ২৩৬-২৫১
আলোকবিজ্ঞান, আলো কি? ২৩৬
কিভাবে আলো সৃষ্টি হয় ২৩৭
লেইজার (LASER) ২৩৯

অলোর অন্যান্য দিক	২৪০
রিফ্লেকশন	২৪১
কনকেভ-কনভেক্স লেন্স ও আয়না	২৪২
রংয়ের খেলা	২৪৩
প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী রং	২৪৬
ফটোসিনথেসিস	২৪৭
লাইট রিয়েকশন	২৪৮
কালো রিয়েকশন	২৪৯
অক্সিজেন রিলিজ	২৫০
পরিচ্ছেদ ৮	২৫২-২৬৩
রেডিওএক্টিভিটি বা তেজষ্ক্রিয়তা	২৫২
এটমের নিউক্লিয়াস	২৫৩
স্থিতিশীল ও অস্থির নিউক্লিয়াস	২৫৫
অর্ধ-জীবন (টি ১/২)	২৬০
কার্বন ডেইটিং	২৬২
পরিচ্ছেদ ৯	২৬৪-২৭৩
বিদ্যুৎ ও চুম্বক	২৬৪
ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ কি?	২৬৪
ব্যাটারী	২৬৬
ইলেকট্রিক্যাল ভলটেজ, কারেন্ট	২৬৭
ইনস্যুলেটর ও কন্ডাক্টার	২৬৮
রেজিসটেন্স	২৬৯
চুম্বক কি?	২৭০
পরিচ্ছেদ ১০	২৭৪-২৯৬
কম্পিউটার বিপ্লব	২৭৪
কম্পিউটার কি?	২৭৬
আধুনিক কম্পিউটার	২৮৪
বর্তমান কম্পিউটার বিজ্ঞান	২৮৬
কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে?	২৮৭

কম্পিউটারের ভেতরের যন্ত্রাংশ	২৮৮
এ্যরিথমেটিক এবং লজিক ইউনিট	২৮৮
মেমরী ইউনিট	২৯০
কন্ট্রোল ইউনিট বা নিয়ন্ত্রণ অঙ্ক, ইনপুট/আউটপুট ইউনিট	২৯১
অপারেটিং সিষ্টেম বা কার্য-পরিচালনা ব্যবস্থা	২৯২
কম্পিউটার সফটওয়ার বা তরল যন্ত্রাংশ	২৯২
কম্পিউটার ও ইনটারনেট	২৯৪
পরিচ্ছেদ ১১	২৯৭-৩০৭
টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি	২৯৭
মৌলিক টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি	২৯৮
এ্যানালগ সিগন্যাল বা তরঙ্গ	২৯৯
ডিজিট্যাল সিগনাল	৩০১
যোগাযোগ স্যাটেলাইট	৩০২
মাইক্রওয়েভ	৩০৪
মাইক্রওয়েভ ট্রান্সমিশন ও রিসেপশন	৩০৫
ফাইবার অপটিক্স	৩০৬
পরিচ্ছেদ ১২	৩০৮-৩১৩
এনার্জি	৩০৮
এনার্জি কি?	৩০৮
বিভিন্ন ধরনের এনার্জি, ম্যাস (বস্তু) ও এনার্জি	৩০৯
কিনেটিক এনার্জি, পটেনশিয়াল এনার্জি	৩১০
আভ্যন্তরীণ এনার্জি, অন্যান্য এনার্জি, এনার্জি রূপান্তর	৩১১
পরিচ্ছেদ ১৩	৩১৪-৩২৪
মহাকাশ অনুসন্ধান	৩১৪
মৌলিক রকেট প্রযুক্তি	৩১৫
থ্রাষ্ট বা ধাক্কা	৩১৬
এফিসিয়েন্সি বা কার্যদক্ষতা	৩১৭
মিশন	৩১৮

পাওয়ার সাপ্লাই	৩২০
এস্কেপ ভেলোসিটি বা মুক্তগতি	৩২২
পরিচ্ছেদ ১৪	৩২৫-৩৪০
প্রাণীজগত, জীবন বা প্রাণ আসলে কি?	৩২৫
মানবশিশু	৩২৮
ডিএনএ এবং আরএনএ	৩২৮
গর্ভাশয়ে ভ্রুণ	৩৩০
মায়ের গর্ভে শিশু	৩৩২
মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়	৩৩৩
সক্রিয় একটি অপূর্ব পাম্প হৃদযন্ত্র	৩৩৭
শেষকথা	৩৩৮
তৃতীয় খণ্ড	৩৪১-৫২৫
দ্বীন ও বিজ্ঞান	৩৪২
ভূমিকা	৩৪২
পরিচ্ছেদ ১	৩৪৪-৩৫৯
ইসলাম, জ্ঞান ও বিজ্ঞান	৩৪৪
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির মৌলিক উৎস হচ্ছে কুরআন শরীফ	৩৪৫
কুরআন ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অমুসলিম গবেষকদের উক্তি	৩৪৬
পরিচ্ছেদ ২	৩৬০-৩৬৪
যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হচ্ছে আল-কুরআন	৩৬০
পরিচ্ছেদ ৩	৩৬৫-৩৮২
আল-কুরআনের আলোকে বিজ্ঞান	৩৬৫
সময়ের আপেক্ষিক ধারণা	৩৬৬
একদিন হাজার বছর বা পঞ্চাশ হাজার বছর	৩৬৭
সময় ভিন্নভাবে চলমান হতে পারে	৩৬৮

সময়ের উল্টো গতি ও কিয়ামতের বর্ণনা ৩৬৯
পুনরুত্থান সম্পর্কে কাফিরদের প্রশ্ন ৩৭০
কুরআনে বর্ণিত বিশ্বতত্ত্ব বা কজমোলজি ৩৭৩
সময় উল্টো চলার ব্যাখ্যা ৩৭৫

পরিচ্ছেদ ৪ ৩৮৩-৪৩৭
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বজগতে আল্লাহর গুণাবলীর বিকাশ ৩৮৩
রব্বুবিয়তের স্বরূপ ৩৮৪
বস্তুজগতে রব্ব গুণের স্বরূপ ৩৮৫
বিজ্ঞানের আলোকে জগৎ পরিচালনার স্বরূপ ৩৮৬
বস্তুর গঠনপ্রণালী ৩৮৬
বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল মৌলিক শক্তিবলী ৩৮৯
কিভাবে প্রতিটি অণুকণা ক্ষয় ও পরিবর্তিত হচ্ছে ৩৯৪
সূর্যের জীবন কবে এবং কেন শেষ হবে? ৩৯৭
পৃথিবীটা প্রাণীদের জন্য উপযোগী হলো কিভাবে? ৩৯৯
আমাদের উপকারে একটি বৃক্ষের অবদান ৪০০
সমগ্র বিশ্বজগৎ মানুষের জন্য সৃষ্ট হয়েছে, এ কথার অর্থ কি? ৪০২
আল্লাহর রব্বুবিয়তের স্বরূপ উন্মোচনে সর্বাপেক্ষা
কাছের জিনিস হচ্ছে মানবদেহ ৪০৫
ডিএনএ (DNA) এবং আরএনএ (RNA): মা-বাবা
থেকে শিশুর দেহের যাবতীয় তথ্যের সূত্র ৪০৬
গর্ভাশয়ে ভ্রূণের জন্ম মুহূর্ত থেকে নতুন সৃষ্ট একটি শিশু
বেড়ে ওঠার বর্ণনা ৪০৮
বাহ্যিক জ্ঞান আহরণের উপায় পঞ্চেন্দ্রিয় ৪১২
সক্রিয় একটি অপূর্ব পাম্প হৃদযন্ত্র ৪১৭
বিজ্ঞান এখনো যা বুঝাতে পারে নি ৪২০
স্বপ্ন কি? ৪২০
বুদ্ধি ও চিন্তার মূলে কি আছে ৪২৫
প্রাণ বলতে কি বুঝায় ৪২৮
বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বে অসম্পূর্ণ ফাঁকসমূহ ৪২৯
জগতসৃষ্টির সূচনা ৪৩০

গ্রাণ্ড ইউনিফিকেশন ইপোক বা মহা একক সময়	৪৩১
ইনফ্লেশন স্টেজ বা স্ফীতি হওয়ার কাল	৪৩২
পার্টিকেল বা পরমাণু সৃষ্টির কাল	৪৩৩
অণুর জন্মকাল	৪৩৪
বিচ্ছিন্নতার শুরু	৪৩৫
উপসংহার	৪৩৮-৪৪৫
রব্বুবিয়াতের ব্যাপক অর্থ আদি-অনন্ত পালনকারিতা	৪৩৮
জগতটি যান্ত্রিক নয়	৪৩৮
দর্শন চুড়ান্ত মহাসত্য উদঘাটন করতে ব্যর্থ হয়েছে	৪৩৯
বৈষয়িক উৎকর্ষতা ইতিহাসের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা	৪৪০
শেষকথা: ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা	৪৪২
পরিশিষ্ট -১	৪৪৬-৪৫৪
ইসলামী স্বর্ণযুগে বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদদের মতামত	৪৪৬
পরিশিষ্ট -২	৪৫৫-৪৭০
আল-কুরআনের বৈজ্ঞানিক আয়াতমালা	৪৫৫
পরিশিষ্ট -৩	৪৭১-৪৭৫
ইসলামী স্বর্ণযুগে প্রসিদ্ধ কয়েকজন মুসলিম বিজ্ঞানী	৪৭১
মুসলিম বিজ্ঞানীদের সময়রেখা	৪৭২
পরিশিষ্ট -৪	৪৭৬-৪৭৯
ইংরেজি ভাষায় আরবি শব্দব্যবহারের একটি তালিকা	৪৭৬
পরিশিষ্ট -৫	৪৮৯-৫১৩
কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তাআলার পরিচিতি ও বিজ্ঞানসম্পর্কিত আয়াতমালা	৪৮৯
আল্লাহ তা'আলার পরিচিতি সম্পর্কিত আয়াতমালা	৪৮১
জগতসৃষ্টি সম্পর্কিত আয়াতমালা	৪৮৬

জগতের মধ্যে ব্যালান্স সম্পর্কিত আয়াতমালা	৪৯১
পাহাড় সৃষ্টি সম্পর্কিত আয়াতমালা	৪৯২
অণু -পরমাণু সম্পর্কিত আয়াতমালা	৪৯৩
মানবসৃষ্টি সম্পর্কিত আয়াতমালা	৪৯৩
জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি সম্পর্কিত আয়াতমালা	৪৯৮
শিশু ছেলে-মেয়ে হওয়া পিতার উপর নির্ভরশীল সম্পর্কিত	৫০০
পানি সম্পর্কিত আয়াতমালা	৫০০
স্থান ও কাল সম্পর্কিত আয়াতমালা	৫০৫
জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ ভ্রমণ সম্পর্কিত আয়াতমালা	৫১০
ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কিত আয়াতমালা	৫১১
ফিরাউন ও তার লাশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আয়াতমালা	৫১৩
পরিশিষ্ট -৬	৫১৪-৫২০
পবিত্র হাদীস শরীফের আলোকে স্বাস্থ্য	৫১৪
সহায়ক গ্রন্থাদি / References	৫২১-৫২৫



ইসলাম ও বিজ্ঞান (৩ খণ্ডে সমাপ্ত)

বিশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ

রচনা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

গবেষণা বিভাগ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার, সিলেট, বাংলাদেশ।

Copyright NOTICE:

All rights reserved. This electronic book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the author except for the use of brief quotations in book review. This electronic book may only be used for private reading, it is forbidden to print and distribute all or any part of it and distribute for commercial purposes.

কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির

দু'আ ও বাণী

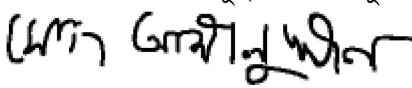
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমার প্রিয় মুরীদ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী এই গ্রন্থটি বেশ পরিশ্রমের বিনিময়ে রচনা করেছেন। এতে ইসলামের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে ইতিহাস ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে।

আধুনিক যুগে মানুষ বিজ্ঞানকে খুব বেশি আকড়ে ধরেছে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া কেউ কিছু বুঝতে বা বিশ্বাস করতে চায় না। লেখক বইটিতে প্রমাণ করতে চেষ্টা চালিয়েছেন যে, বিজ্ঞানের কোনো হক্ব তথ্য ইসলামের সঙ্গে মোটেই সংঘাতময় নয়- বরং এসব ক্ষেত্রে শুধু মিল আর মিল বিদ্যমান। আমি মনে করি সকলেই এই কিতাব পাঠ করে উপকৃত হবেন। আমি দু'আ করি এটা পাঠকদের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হোক।

আমি লেখকের জন্য আল্লাহর পবিত্র দরবারে দু'আ করি, তিনি যেন তার এ প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। সবশেষে বইটির বহুল প্রচার কামনা করে শেষ করছি।

মুহাম্মদ আমীনুদ্দীন



প্রতিষ্ঠাতা মুহতামীম
দারুল উলূম জামিয়া ইসলামিয়া অলৈতলী ও কাতিয়া
জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ
২৩ জুন, ২০০৬ ঈসায়ী।

“শাহানশাহ্‌, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে যাকিছু আছে নভোমণ্ডলে ও যাকিছু আছে ভূমণ্ডলে” [সুরা জুমু'আ ঃ ১]।

ভূমিকা

অলহামদুলিল্লাহ্‌। যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। যিনি সকল জ্ঞানের অধিকারী। যাঁর মর্তবা, মর্যাদা ও শান সর্বোচ্চে। যিনি আকাশসমূহ এবং এর মধ্যে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। যাঁর যাবতীয় নামসমূহ সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সুন্দর। তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ইহ-পরলোকে সবকিছুর ওপর। তিনিই গুপ্ত ও ব্যাপ্ত এবং তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে তাঁর একান্ত অনুগ্রহ ছাড়া কেউ কিছু আয়ত্ব করতে পারে না। মহান মেহেরবান বিশ্বপ্রভু যিনি জীন ও ইনসানের মধ্যে সকল দ্বীনদার, ঈমানদার, সন্দেহবাদী, কাফির-বেঈমান ও জীবজন্তুসহ যাবতীয় মাখলুকাতের পালনকর্তা। যাঁর শক্তি ও হুকুম ছাড়া এ মহাবিশ্বের একটি বস্তুও অস্তিত্ব বজায় রাখতে অক্ষম। কত মহান আমাদের একমাত্র প্রভু, কত মহামহীম বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা’আলা। তাঁর প্রশংসা করে কেউ শেষ করতে পারবে না। এ অনভিজ্ঞ লেখক তাঁর অনুগ্রহ ও করুণার ভিক্ষাপ্রার্থী। তাঁর অনুগ্রহ ও ইচ্ছা ছাড়া, একটি অক্ষরও লেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করছি আমার কলমটিকে সঠিক পথে, তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টির পথে পরিচালনার জন্য। আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহ্‌র কাছে অভিশপ্ত শয়তানের ওয়াসওয়াসা এবং নফসে আম্মারার কুমন্ত্রণা থেকে।

নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

গণনাতীত দরূদ ও সালাম পেয়ারে নবীজী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি। যিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন। যাঁর ওয়াছিলায় বিশ্ব হয়েছে আলোকিত তাওহীদের পবিত্র নূরে। যে আখেরী নবীর আগমনের ফলে বর্বর যুগের ইতি হয়েছিলো। যাঁর মাধ্যমে প্রভু দয়াময় মানুষকে দান করেছেন চিরন্তন মহাসত্যের আলো আল-কুরআনুল কারীম। পেয়ারে নবীজী, মাহবুবে খোদা, রাহমাতুল্লিল আলামীন, দু’জাহানের বাদশা, স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, উম্মতের শাফায়াতকারী- দরূদ ও

সালাম প্রেরণ করছি তাঁর প্রতি কোটি কোটি বার। আল্লাহ পাক শান্তি বর্ষণ করুন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী সাহাবায়ে কিরামের প্রতি, তাঁর বংশধরদের প্রতি, তাঁর পবিত্র বিবিগণদের প্রতি।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর পবিত্র দরবারে অশেষ শুকরিয়া। আল্লাহর এই নাচিজ বান্দাহ ঈমানী আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর গবেষণামূলক এ গ্রন্থটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে সত্যিই আনন্দবোধ করছি। তবে এই বিরাট কাজটি আঞ্জাম দেওয়া মহান আল্লাহ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হতো না, সুতরাং এ কাজের জন্য আমার নিজের গৌরবের মোটেই কিছু নেই। আমি তাই আবারও মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে উন্মুক্তচিত্তে উচ্চারণ করছি- আলহামদুলিল্লাহ!

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর গবেষণায় পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এই ভূমিকায় কিছু মৌলিক কথা লিপিবদ্ধ করেছি। আমি আশা করবো সবাই মূল গ্রন্থের বিষয়বস্তু পাঠের পূর্বে একটু ধৈর্য সহকারে অপেক্ষাকৃত কিছুটা দীর্ঘ এই ভূমিকাটি পাঠ করবেন।

জ্ঞান আহরণের কারণ ও উপায়

এটা জেনে রাখা দরকার, জ্ঞান হচ্ছে একটি অপূর্ব নূর। আরবি 'ইল্‌ম' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'জ্ঞান'। ইল্‌ম শব্দের পূর্ণ অর্থ ব্যাপক। অহির্জ্ঞান, আল্লাহর পছন্দসই জীবন পরিচালনা ও উপাসনা পদ্ধতির জ্ঞান, মহাসত্যের জ্ঞান, আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উপায়-পদ্ধতির জ্ঞান, আল্লাহ-পরিচিতির জ্ঞান, বস্তুজগৎ সম্পর্কিত জ্ঞান, ধর্মজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি প্রত্যেক জ্ঞানের শাখার সমন্বয়ে যে মহাজ্ঞান তা-ই হচ্ছে ইল্‌ম।

ইল্‌মের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ। এ জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তার নিজের পরিচিতি, প্রভুর পরিচিতি, ইহ-পরজীবনের সার্বিক সুখ-শান্তি ইত্যাদি অর্জন করতে সক্ষম হয়। কয়েকটি পদ্ধতিতে এ লক্ষ্য হাসিল হতে পারে।

(১) বুদ্ধি বা আক্বল দ্বারা ইলম অর্জন

আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ পাকই মানুষকে অনেক ধরনের উপাদান ও উপায়-অবলম্বন দান করেছেন। এর মধ্যে আক্বল বা বুদ্ধি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় উপাদান। এটা মানবীয় একটি মৌলিক গুণ। আক্বল সঠিকভাবে ব্যবহার করলে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হয়। অপরদিকে এর অপব্যবহারে আল্লাহ থেকে দূরে যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এ দু'টি দিক বিশ্লেষণ করা জরুরী।

ঈমান বা গায়েবে বিশ্বাস আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক বিরাট নিয়ামত। এটা এমন এক উপাদান যা চেতনাশীল মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয়। অবশ্য আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া ঈমানের ছোঁয়া কেউ পায় না। ঈমানহীন মানুষ আদলে দুর্বল চেতনাহীন। এরূপ মানুষের মধ্যে লুকানো অনেক মানবিক গুণাবলী বিকশিত হয় না। তাদের মধ্যে সত্যিকার ভালোবাসা অনুপস্থিত। ঈমানহীন মানুষ আক্বলকেও সঠিকভাবে ব্যবহার করতে জানে না। তবে ঈমানদারও আপন ঈমানের শক্তির মানদণ্ডে তার আক্বলকে সঠিক পথে চালাতে পারে মাত্র। যার ঈমান যতো বেশি সবল তার আক্বলও ততো বেশি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে যার ঈমানে দুর্বলতা আছে তার আক্বলও ব্যবহৃত হয় দুর্বলভাবে। তার আক্বল দিয়ে সঠিক ইলম তথা প্রভুর পরিচিতির পূর্ণতাপ্রাপ্তি লাভ করে না।

ঈমানের নূর যে ভাগ্যবানের বুকে প্রজ্জ্বলিত, সে আক্বল দিয়ে আল্লাহর সঠিক পরিচিতি অর্জন করতে পারে তথা ইলমের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে ধন্য হতে পারে। এরূপ মহাত্মন এ জগতে বিরল। নবী, রাসূলরা এবং আল্লাহর একান্ত বন্ধুজনরাই এই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। বস্তুত এরূপ সর্বোচ্চ ইলম একমাত্র স্বয়ং প্রভুর অনুগ্রহ থেকেই অর্জিত হয়। এটা প্রভু-প্রদত্ত জ্ঞান।

ঈমান নিয়ে আক্বলকে আরো একাধিক রাস্তায় পরিচালিত করে ইলমের উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছা সম্ভব। এসব রাস্তা বা উপায় হচ্ছে মূলত দু'টিঃ

(১) সৃষ্ট জগৎ (আলমে খালক) নিয়ে গবেষণা ও (২) আল্লাহর মুহাব্বাতের মাধ্যমে ইলম হাসিল।

(১) সৃষ্ট জগৎ নিয়ে গবেষণায় আক্বলের ব্যবহার

আক্বল বা বুদ্ধি দিয়েই মানুষ সৃষ্ট জগৎ নিয়ে বিজ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে গবেষণা করে। কিন্তু ঈমান ছাড়া এ গবেষণায় বাহ্যিক জগতের কার্যকারিতা উদঘাটন হলেও চূড়ান্ত ইলম বা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হয় না। পক্ষান্তরে ঈমানের নূর সহকারে আলমে খালক নিয়ে গবেষণা ও এর চলনপদ্ধতি অবলোকন করা এবং জানার মাধ্যমে ইলমের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছা যায়। ঈমানসহ গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার সময় যখন সৃষ্টির রহস্যাবলী উদঘাটিত হতে থাকে, তখন গবেষকের ঈমানী শক্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। এক পর্যায়ে এসে সে চূড়ান্ত ইলমের নাগাল পেয়ে যায়। এ থেকে হৃদয়ে খোদাপ্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। ইবাদত ও আল্লাহর স্মরণে সে বিভোর হয়ে প্রভুর সান্নিধ্য তথা পারিচিতি লাভে ধন্য হয়।

ঈমানসহ বিজ্ঞানচেতনা একটি অমূল্য সম্পদ। এর মাধ্যমে ইহলৌকিক উপকার (বৈষয়িক উন্নতির ক্ষেত্রে) এবং আল্লাহপ্রাপ্তি, এ উভয়টিই মানুষের ভাগ্যে জুটে। পক্ষান্তরে ঈমানহীন বিজ্ঞানচেতনায় ইহলৌকিক উন্নয়নে উপকারী হলেও চূড়ান্ত ইলম তথা আল্লাহর পরিচিতি অর্জিত হয় না। এরূপ ইহলৌকিক বা বৈষয়িক উন্নয়ন থেকেও শেষ পর্যন্ত মানবজীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় না। মানুষের মনের গভীরে যে আকাঙ্ক্ষা সদাসক্রিয় তা হচ্ছে, আত্মিক প্রশান্তি কামনা। এ প্রশান্তি আসে একমাত্র আল্লাহর পরিচিতি ও তাঁর প্রতি মুহাব্বাতের মাধ্যমে। জাগতিক বস্তু চোখের জন্য শান্তিময় ও চমকপ্রদ হতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে শরীরের জন্যও তা আরামদায়ক হয়। কিন্তু মনের গভীরে মানুষ যে প্রশান্তির অন্বেষা ও তৃষ্ণা অনুভব করে তা কিন্তু বস্তু থেকে কখনো পাওয়া যায় না। এ তৃষ্ণা বস্তু ও ধন-দৌলত দিয়ে মেটানো থেকে স্বতন্ত্র। কারণ, এ তৃষ্ণা তো মেটাতে পারে আল্লাহর স্বরণ ও প্রেমের সুধা। দেহের মধ্যে সুস্থতা, নতুন দামী কাপড়, সুন্দরী নারীর সংসর্গ, দালান-অট্টালিকা, টাকা-কড়ি-গাড়ি এগুলোই যদি হৃদয়ের প্রশান্তির উপাদান হয়ে যেতো তবে মানুষ, মানুষ হতো না বরং যন্ত্র হতো। কিন্তু মানুষ তো আর যন্ত্র নয়।

ঈমান বুকে পুষে জগৎ নিয়ে চিন্তাশীল মানুষ ইলম অর্জন করতে পারে। এ ইলম তাকে খোদাপ্রাপ্তি পর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম। ইহলৌকিক বাহ্যিক জ্ঞান থেকে বৈষয়িক অভাব অনটন দূর হতে সহায়ক হয়, এবং আত্মিকভাবে উন্নত হয়ে পারলৌকিক জ্ঞানের দ্বার তার জন্য উন্মুক্ত হয়।

মনে রাখা দরকার ঈমান হচ্ছে চূড়ান্ত ইলমের পূর্বশর্ত। আর জাগতিক জ্ঞানার্জনে অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনে ঈমানদারিত্ব এক অপূর্ব নিয়ামত। এরূপ পদ্ধতিতে ইলম হাসিল হলে জগতের জন্য হবে কল্যাণময়। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রকৃত শান্তি।

(২) আল্লাহর মুহাব্বাতের মাধ্যমে ইলম হাসিল

চূড়ান্ত ইলম অর্জন করার এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সিদ্দিকীনদের পথ। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত গোটা কিছু লোকের জন্য প্রযোজ্য। এটা সর্বসাধারণের জন্য নয়। তবে এ পথই সর্বোচ্চ। এ পথে ইলম অর্জনকারীরা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর খাস অনুগ্রহপ্রাপ্ত।

আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন মানুষ একমাত্র সে-সময়েই থাকতে পারে যখন তাঁর ঈমানী শক্তি সুদৃঢ় হয় এবং হৃদয়ে প্রভুকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে। আল্লাহকে জানা-চেনা, তাঁর দীদার লাভ করা এই অন্বেষীর মনে অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত এই আকাঙ্ক্ষা থেকে তার মধ্যে ইলমের দরোজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। সে তখন জগতসমূহের অন্তর্নিহিত স্বরূপ উপলব্ধি করতে থাকে। আধ্যাত্মিক জগতের চিত্র তাঁর উন্মুক্ত হৃদয়নেত্রে দৃশ্যমান হয়। আল্লাহর অনুগ্রহে সে হয়ে ওঠে সত্যিকার জ্ঞানবান। তবে এ জ্ঞান বিজ্ঞান নয়, বরং ইহ ও পরজগৎ সম্পর্কে তাত্ত্বিক জ্ঞান। এ জ্ঞানের মাধ্যমে ইহলোকে বৈষয়িক ফায়দা না হলেও পারলৌলিক ক্ষেত্রে এটা অসীম সম্বল। খোদার আশিক হয়ে জ্ঞানলাভ সর্বোচ্চ জ্ঞান। একমাত্র অনুগ্রহপ্রাপ্তরাই এ জ্ঞানের সন্ধান পান।

এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তার সারাংশ হচ্ছে, জ্ঞানের সংজ্ঞা হলো ঈমানের সাথে ইহ-পারলৌকিক জীবন ও জগতসমূহের রসহ্য জেনে নেওয়া, এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে

আল্লাহর পরিচিতি অর্জন করে হৃদয়ে প্রশান্তি স্থায়ী করা। এবার জ্ঞানের ব্যাখ্যা আরোও ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করা জরুরী।

জ্ঞানের প্রকারভেদ

জ্ঞানের প্রধান দু'টি পদ্ধতি অর্থাৎ সৃষ্টজগৎ নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে এবং আল্লাহর ধ্যানের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের, একাধিক শাখা-প্রশাখা আছে। এগুলোর মধ্যে সৃষ্টজগৎ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রধান শাখা হচ্ছে ৩ টি যথাঃ (ক) পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যবহারে জ্ঞানলাভ, (খ) বৈজ্ঞানিক উপায়ে গবেষণার মাধ্যমে ও (গ) জগৎ নিয়ে চিন্তার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন। এ তিনটির পূর্ণ ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

(ক) পঞ্চেন্দ্রিয় থেকে জ্ঞান

বাহ্যিক জগতে আমাদের চলাফেরা ও বস্তুজগতকে চেনার জন্য যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে এগুলোকে সবাই ব্যবহার করে। এগুলোর মাধ্যমে আমাদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা জিনিসপত্রের সাথে আমাদের পরিচিতি ঘটে। একটি শিশুর জন্ম থেকেই এ জ্ঞান অর্জন শুরু হয় এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান আমাদের মস্তিষ্কে যে স্মরণ রাখার মেমরী সেলগুলো আছে সেখানে তা রক্ষিত হয়। এ মেমরী ইউনিটটি অত্যন্ত ব্যাপক। সারাজীবনের যাবতীয় তথ্য এখানে জমা থাকার পরও তা পরিপূর্ণ হয় না। মগজের মধ্যে জমাকৃত মেমরীতে পঞ্চেন্দ্রিয় থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানই শুধু থাকে না, বরং সবধরনের জ্ঞান বা ইলম এখানে রক্ষিত হয়ে প্রয়োজনে তা ব্যবহৃত হয়। আমরা তা তাগিদমাফিক কাজে লাগাই। জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী এই মেমরী থেকেই আমরা সময় সময় স্মরণ করে থাকি। বিশ বছর আগে বা ত্রিশ বছর আগে সংঘটিত কোন ঘটনা, কোন একটি মুখের ছবি, কোন দুঃখ-কষ্ট-অনুভূতির কথা এই মেমরী থেকে আমরা খুঁজে বের করে নিয়ে আসতে সক্ষম। এ হচ্ছে মেমরীর শক্তি।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান কিন্তু সীমাবদ্ধ। এটা বাহ্যিক জগতের জ্ঞান। কোন বস্তু বা বিষয়ের অন্তর্নিহিত জ্ঞান বা রহস্য পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যবহারের মাধ্যমে উদঘাটিত হতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে, একটি লৌহখণ্ডে হাত দিয়ে আমরা বলতে পারবো এটা উষ্ণ না ঠাণ্ডা। আমাদের মধ্যে তক্ব (Touch) নামক যে ইন্দ্রিয়টি আছে সেটি দিয়েই আমরা এ জ্ঞানটি আর্জন করতে পারি। এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, এ লৌহখণ্ডটির ভেতরের প্রতিটি অণু-পরমাণু শীতল বা উত্তপ্ত হয়ে আছে কোন্ কারণে, তাহলে আমরা কোন্ ইন্দ্রিয় দিয়ে এর জবাব দেব? সুতরাং বুঝা গেল তক্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুটির তাপমাত্রা আমরা অনুভব করতে পারি, কিন্তু তাপমাত্রা হওয়ার কারণ জানতে অক্ষম। এর কারণ জানতে হলে আক্বলকে (বুদ্ধিকে) ব্যবহার করে অন্য কোন উপায় আবিষ্কার করতে হবে।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের সীমাবদ্ধতার অপর একটি দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুন। চোখ একটি অপূর্ব ইন্দ্রিয়। এর মাধ্যমে আমরা সবকিছুই দেখতে পারি। মনে করুন একটি কক্ষে মেঝের উপর একটি বস্তু আছে। কক্ষের ভেতর আলো জ্বলে আছে তাই বস্তুটিকে আপনি দেখতে পারছেন। কিন্তু যখন গভীর রাতে বাতিটি নিভিয়ে দেবেন তখন বস্তুটি আর আপনি দেখতে পারবেন না। এর কারণ কি? কারণ হলো বাতি ছাড়া বা আলো ছাড়া কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের জবাব আপনার ইন্দ্রিয় থেকে পাবেন না। চোখ শুধু জানে আলো থাকলে সে বস্তুটি দেখতে পারে আর না থাকলে পারে না। এর সঠিক জবাব জানতে হলে আপনার আক্বলকে ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ আপনাকে পরীক্ষা করে জানতে হবে যে, আলো যখন বস্তুর উপর পতিত হয় তখন সে আলো বস্তুটি থেকে ফিরে এসে আপনার চোখের ভেতর পড়ছে- এ কারণেই আপনি দেখতে পারেন। মোটকথা পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জগতের ঘটনাবলী (চোখের মাধ্যমে) দেখা যায়, (তক্বের মাধ্যমে) অনুভব করা যায়, (কর্ণের মাধ্যমে) শোনা যায়, (নাকের মাধ্যমে) গন্ধ পাওয়া যায় এবং (জিহ্বার মাধ্যমে) স্বাদ নেওয়া যায়। কিন্তু ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত কারণ জানা যায় না। এরজন্য প্রয়োজন জ্ঞানার্জনের অন্য কোন উপায়-অবলম্বন। আর যে উপায়ে তা সম্ভব সেটি হলো জগৎ নিয়ে গবেষণা তথা বিজ্ঞানের ব্যবহার।

(খ) বৈজ্ঞানিক উপায়ে গবেষণার মাধ্যমে ইলম অর্জন

আমরা এ জগতে অনেককিছু অহরহ দেখি। অনেককিছু হাত দিয়ে ছুঁয়ে অনুভব করি। সচরাচর সংঘটিত ঘটনাবলী আমাদের বাহ্যিক পঞ্চেন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে। বস্তু জগতের এসব ঘটনাবলীকে নেচারেল ফেনোমেনা বা স্বাভাবিক ঘটনাবলী বলা হয়। আমাদের মনে এই প্রাকৃতিক কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। বিভিন্ন ঘটনাবলী কেন ঘটে? এর পেছনে কারণ কি? আমাদের ইন্দ্রিয় এর জবাব দিতে পারে না। আমরা তখন আক্বলকে ব্যবহার করা শুরু করি। নানান উপায়-অবলম্বন ব্যবহার করে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর রহস্য উদঘাটনে অগ্রসর হই। ঘটনাবলীর কারণ সম্পর্কে মনের মধ্যে জাগ্রত কল্পনা বা ধারণার সত্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে থিওরী (সু-চিন্তিত ধারণা) আবিষ্কার করি। তারপর এটাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ করি। এ উপায়ে জ্ঞানার্জনকে বলে বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কোন জাগতিক বা নেচারেল ঘটনাবলীর রহস্য উদঘাটন করে আমরা মনের আকাঙ্ক্ষা ও পিপাসা নিবারণ করি। এ উপায়ে জ্ঞানান্বেষণের মাধ্যমে অপর একটি ফায়দা হয়- আর তাহলো, উদঘাটিত তথ্য থেকে প্রযৌক্তিক উপায়ে মানবকল্যাণে ব্যবহারযোগ্য অনেক বস্তু সৃষ্টি করা। একটা দৃষ্টান্ত হলো, সূর্য কেন জলন্ত আছে তা জানার মাধ্যমে আমাদের মনের প্রশ্নের জবাব মেলে, এবং এর থেকে আগত উত্তপ্ত আলো ব্যবহার করে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি। এর ফলে একটি ছোট্ট শহরকে হয়তো রাতের বেলা আলোকিত করা যেতে পারে বা সোলার গাড়ি তৈরী হতে পারে। অপর আরেকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

মানুষ নিজের মনে জাগ্রত প্রশ্নের জবাব খুঁজতে বস্তু বা মেটারের ভেতরে যে পারমাণবিক ক্ষেত্রে আনবিক বিরাট শক্তি নিহিত আছে তা জানতে পারলো। এরপর শুরু হলো এ শক্তিকে কিভাবে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়। চললো গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা। শেষ পর্যন্ত আনবিক চুল্লি তৈরী করে ইউরেনিয়াম নামক পদার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে মোটা অঙ্কের বিদ্যুৎ সৃষ্টির পথ খোলা হয়ে গেল। তাহলে এটা পরিষ্কার যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে বস্তু জগতকে জানার মধ্যে দু'টি উপকার আছে- ১. মনের মধ্যে জাগ্রত প্রশ্নের জবাব আর ২. প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহারে মানবকল্যাণ তথা বৈষয়িক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন।

তবে ইলম অর্জনের এ শাখাটিরও সীমাবদ্ধতা আছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই বস্তু জগতের বেলায়ও সচরাচর ঘটিত ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত কারণ বলতে অপারগ। অবশ্য কার্য-কারণ নীতি কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে সক্ষম। যেমন কোন ঘটনার পেছনে যে আরেকটি ঘটনা নিহিত তা কার্য-কারণ নীতির মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়। একটা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা প্রয়োজনীয় মনে করছি।

আমরা জানি পানি একটি তরল পদার্থ। কিন্তু এ পানি বিশেষ কারণে কঠিন পদার্থ ও গ্যাসে রূপান্তরিত হতে পারে। কঠিন পদার্থ হিসেবে এই পানিকে আমরা আইস বা বরফ অবস্থায় দেখতে পাই। আর গ্যাস হিসেবে ওয়াটার ভেপার বা বাস্পাকারে দেখি। পানির এই বিভিন্ন অবস্থার কারণ আছে। আর এ কারণ হচ্ছে পানির মধ্যকার তাপমাত্রা। তাপমাত্রা এক একটি সীমার মধ্যে থাকলে পানি তরল, কঠিন বা বাস্পাকারে থাকে। অর্থাৎ পানির তাপমাত্রা ১ থেকে ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের ভেতর হলে তা তরল, ০ বা তার নীচে হলে কঠিন এবং ১০০ ডিগ্রীর বেশি হলে বাস্প হয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে একই পানির মধ্যে এই তাপমাত্রার তারতম্যে এ বিভিন্ন অবস্থা কেন হয়? এর পেছনে কোন্ কারণটি নিহিত? এ প্রশ্নের জবাব জানতে হলে আমাদেরকে প্রথমে তাপমাত্রা বা তাপ আসলে কি তা জানতে হয়। এবার আমরা তাপ সম্পর্কে আরেকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। তাপমাত্রায় রদবদল আনতে হলে পানির মধ্যে হিট এনার্জি বা তাপশক্তি প্রদান করতে হবে। এরপর প্রশ্ন আসে তাপশক্তি কি? এভাবে একটার পর আরেকটা প্রশ্ন আমাদের মনে পানির বিভিন্ন অবস্থার কারণ জানার জন্য জাগ্রত হতে থাকে। একটি অবস্থার কারণ জানতে গিয়ে একগুচ্ছ কারণ জানার প্রয়োজন পড়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকেই কার্যকারণ নীতি বলা হয়। প্রত্যেকটি ফিজিক্যাল ঘটনার পেছনে কারণ থাকে, বরং একটি চেইন অব রিজোন আছে। এই কারণসমূহ জানার মাধ্যমেই আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে জগতকে চিনতে পারি। কিন্তু এ কারণগুলো মানুষ সহজে জানতে পারে নি। বর্তমান পর্যন্ত জানা বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী হাজার হাজার বছরের গবেষণার ফল। 'কারণ' বের করতে যেয়ে মানুষ অতীতে ভুল করেছে (অর্থাৎ কারণ যা ভেবেছিলো, তা পরবর্তীতে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে) এবং আজো ভুল হচ্ছে। এছাড়া কার্যকারণ নীতির মাধ্যমে চুড়ান্ত কারণ জানা যায় না। এ উপায়ে দৃশ্যমান জগৎ সর্ম্পকে জানার বা জ্ঞানার্জন করার সীমাবদ্ধতা আছে। বাস্তবে কার্যকারণ

নীতির মাধ্যমে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করার পরই চুড়ান্ত কারণ জানার প্রয়োজন এসে উপস্থিত হয়। তখন আর অগ্রসর হওয়া যায় না। উল্লেখিত পানির দৃষ্টান্তটি আবার গবেষণা করলেই কথাটি স্পষ্ট হবে।

আমরা যখন জানতে পারলাম তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বা হ্রাস হলে পানির অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তখন পরবর্তিতে দু'টি প্রশ্ন সাথে সাথে আমাদের মনে জাগ্রত হয়: (ক) তাপমাত্রার জন্য দায়ী হিট এনার্জি বা তাপশক্তি কি এবং (খ) এই তাপের প্রতিক্রিয়ায় পানির মধ্যে কেন পরিবর্তন আসে? এ দু'টি প্রশ্নের মধ্যে দু'টি ভিন্ন কার্যকারণ চেইন নিহিত। প্রথমটি স্বয়ং তাপমাত্রার তারতম্যের কারণ ও এর পেছনের কার্যকারণ চেইনের উপর সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়টি পানির মধ্যে তাপমাত্রার প্রতিক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত, অর্থাৎ এ কার্যকারণ চেইন পানির উপরই সীমাবদ্ধ। এবার এ চেইন দুটোর একটি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করে দেখা যাক।

দ্বিতীয় চেইনের প্রশ্নগুলো এভাবে হবে: পানির মধ্যে তাপমাত্রা কেন বাড়ে এবং এর প্রতিক্রিয়া কি? এর উত্তরে বিজ্ঞান বলে, পানির ভেতরে যে মলিকিউল বা কণাগুলো আছে তাপশক্তির প্রভাবে তা কম্পন করতে থাকে। তাপমাত্রা যতো বাড়তে থাকবে এই কম্পন ততো বেশি হবে। মলিকিউল-গুলো একটা আরেকটার সাথে ঘর্ষণ করে পানির তাপমাত্রা বাড়াতে থাকে। এক পর্যায়ে (১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হলে) পানির এই কম্পন স্বচক্ষে দেখা যায়, অর্থাৎ পানি ফুটতে থাকে। তাপমাত্রা আরো বেড়ে গেলে মলিকিউলগুলো পানি থাকাবস্থার বন্ড (একটা আরেকটার সাথে আকর্ষণ অবস্থা) থেকে মুক্ত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এই মলিকিউলগুলোর ওজন কমে আসে এবং বাস্পে পরিণত হয়ে বায়ূমণ্ডলে উড়ে যায়। এটুকু হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার প্রশ্নের উত্তর। এবার প্রশ্ন জাগে মলিকিউলগুলো তাপশক্তি পেয়ে কেন এভাবে কম্পন শুরু করে? এর জবাবে বিজ্ঞান বলে, মলিকিউলার বা কণার স্তরে বস্তু এনার্জি পেয়ে কিছু নির্দিষ্ট কারণে এভাবে কম্পন বা এক্সাইটমেন্ট শুরু করে। এনার্জির মাধ্যমে বস্তুর ভেতর কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যার ফলে এটা স্থির থাকতে পারে না। এ বিশ্লেষণ এ প্রসঙ্গে আর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এখানে এসে আমাদের মনের স্পৃহা কিন্তু শেষ হয় না। আমরা এরপর প্রশ্ন করি মলিকিউল এনার্জি পেয়ে যেভাবে প্রতিক্রিয়া করে তা না করে অন্যভাবে প্রতিক্রিয়া কেন করে না বা প্রতিক্রিয়াই বা কেন করে? বিজ্ঞান বলে এটা নেচারেল আইন। আমরা আবার প্রশ্ন করি, নেচারেল আইন এরূপ

কেন, অন্যভাবে কেন হলো না? বিজ্ঞান বলে জানি না! আমরা চুড়ান্ত প্রশ্নে এসে পৌঁছে গেছি।

নেচারেল আইনকে যেরূপ আছে সেরূপ গ্রহণ করে নিতে হবে, আর প্রশ্ন করলে উত্তর মিলবে না, তবে প্রশ্ন অবশ্যই জাগ্রত হয়। (বিজ্ঞানের মাধ্যমে) জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু প্রশ্নের ক্ষেত্রে তা নয়। এখানেই মানুষের রহস্য। সে সীমাবদ্ধতা পছন্দ করে না অথচ সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তাকে থাকতে হয়। মানুষ হচ্ছে বস্তুজগতের বিচরণশীল জীবী কিন্তু তার ভেতরে কি যেন বাস করে যা বস্তুজগতের সীমাবদ্ধতা থেকেও বাড়তি কিছু। জ্ঞানার্জন তথা জানার ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতা মনের ভেতর অশান্তির বীজ বপন করে। সে অনুভব করে নিশ্চয়ই জানার অনেককিছু আছে যা বিজ্ঞানের মাধ্যমে পাওয়া অসম্ভব, কিন্তু কোন উপায়ে এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে রহস্য উদঘাটন হবে? এ প্রশ্নের জবাব পেতে সৃষ্ট জগতের উপর ইলম অর্জনের তৃতীয় শাখার ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

(গ) সৃষ্ট জগৎ নিয়ে চিন্তার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন

জ্ঞানের এ শাখাটি হচ্ছে দর্শন। দর্শনের সংজ্ঞা উপস্থাপন করা সহজ নয়। বলতে হয়, দর্শন কি- তা সিক্সটি-ফোর মিলিয়ন ডলার কুয়েসশন। তবে দর্শনের উদ্দেশ্য অনেকেই বলেন, সত্য উদঘাটন। কিন্তু এ লক্ষ্যে পৌঁছতে দর্শন এ পর্যন্ত ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু দেখাতে পারে নি। দর্শনের মাধ্যমে অগণিত প্রশ্নই মানব মানসে জাগ্রত হয়েছে মাত্র, জবাব বেরিয়ে এসেছে অত্যল্প। যুগে যুগে অসংখ্য ‘ইজম’ মানুষ সৃষ্টি করেছে কিন্তু চুড়ান্ত কোন সত্য বা ‘সত্যইজম’ আবিষ্কার করতে পারে নি। তবে দর্শনের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন ইতিহাসে সক্রিয় ছিলো বা আছে, সুতরাং এর গুরুত্ব অপরিমীস। এছাড়া ইলম অর্জনের এ শাখাটি মানুষের জীবনে সর্বক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টি করে। দর্শন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হয়ে মানবগোষ্ঠি ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে পরিচালিত হয়েছে এবং হচ্ছে- কিন্তু সে পথটি সর্বদা সুপথই ছিলো বা আজো আছে, তা কিন্তু কেউ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবে না।

বিজ্ঞান ও ধর্ম থেকে ভিন্ন এ জ্ঞানের শাখা, ‘দর্শনে’র স্বতন্ত্র একটা স্বরূপ আছে।

সৃষ্ট জগৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার দু'টি পৃথক পন্থা আছে। এর প্রথমটি হচ্ছে ঈমান সহকারে চিন্তা-ভাবনা-গবেষণা- যা হলো সর্বোত্তম, আর অপরটি ঈমানহীনভাবে চিন্তা-ভাবনা ও সত্যোপলব্ধির চেষ্টা- যা হলো নিম্নপর্যায়ের।

ঈমানসহ চিন্তা-গবেষণা

ঈমান সহকারে সৃষ্ট জগৎ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা-ভাবনায় কয়েকটি সুফল পাওয়া যায়ঃ (ক) আল্লাহর কুদরতকে অবলোকন, (খ) ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি, (গ) আল্লাহর অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে অবগতি ও (ঘ) মানবজীবনের রহস্য উদঘাটন।

(ক) আল্লাহর কুদরতকে অবলোকন

চিন্তার একটি অপূর্ব খোরাক হচ্ছে বিশ্বজগতকে ঈমানী আলোকে দেখা। জগতের অসংখ্য পরিচালনার পদ্ধতিকে- নেচারেল আইন বা প্রাকৃতিক নিয়ম বলে অন্ধভাবে বসে থাকা থেকে যে জিনিসটি আভ্যন্তরীণ মানস মননকে রক্ষা করে, তা হচ্ছে প্রভুর প্রতি বিশ্বাস বা ঈমান। প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন যে মূলত আল্লাহর কুদরত ছাড়া আর কিছুই নয় তা অনুধাবন করা যায় ঈমনী চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে। মানুষ যখন এ সত্য উপলব্ধি করে তখনই প্রকৃত দর্শনের সন্ধান পায়।

আসলে দর্শনের মূলে আছে তাওহিদ। আজকের বিভ্রান্ত মানবসমাজকে এ সত্য উপলব্ধি করতে হবে। তাওহীদহীন যাবতীয় দর্শনই মৌলিকভাবে ভ্রান্ত। জগতভাবনায় কেউ যদি তাওহিদী শক্তি বুকে নিয়ে দার্শনিক উপায়ে চিন্তা-গবেষণা করে তবে অবশ্যই তার দৃষ্টিতে আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত ধরা পড়বে। চরম যুক্তিবাদের গণ্ডীসীমা ও ডিগবাজী খেলা থেকে সে মুক্ত হবে। যুক্তিবাদ যে, দর্শনকে পঙ্গু করে রেখেছে সে তা প্রত্যক্ষ করে এর বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে এবং আসল সত্যের সন্ধানে ব্রত হতে পারবে। জগতজুড়ে আল্লাহর সংখ্যাতিত নিদর্শন ও কুদরত অবলোকন করে প্রকৃত জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে জীবনকে ধন্য করে তুলতে পারবে এ সত্যান্বেষী ঈমানদার।

(খ) ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি

ঈমান সহকারে জগতভাবনায় দ্বিতীয় যে উপকার হাসিল হয় তা হলো ঈমানী শক্তির বৃদ্ধি। প্রত্যেক ঈমনাদারেরও ঈমানী স্তর আছে। ঈমানের সর্বোচ্চ স্তরে উপনিত হয়েছিলেন নবী ও রাসূলগণ। এর পরের স্তরে আছেন আল্লাহর বন্ধুজনেরা তথা আওলিয়া ও দরবেশরা। এরপরে যাদের অবস্থান তারা হলেন আলিম-উলামা এবং সবশেষে সাধারণ মুসলমানরা। অবশ্য সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও কারো কারো ঈমানের বিরাট শক্তি থাকতে পারে। আবার অনেক আলিম-উলামার মাঝেও দুর্বলতা থাকাটা অসম্ভব নয়।

ঈমানকে আগে অন্তরে দৃঢ়ভাবে স্থায়ী করে কেউ যদি সূক্ষ্মভাবে জগতভাবনায় রত হয় তবে অবশ্যই তার সেই ঈমান আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠবে। আর ঈমানী শক্তি হচ্ছে চুড়ান্ত জ্ঞানার্জন তথা খোদাপ্রাপ্তির চাবিকাঠি।

(গ) আল্লাহর অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে অবগতি

সৃষ্ট জগতভাবনা-গবেষণায় যদি ঈমানী নূর সম্পৃক্ত থাকে তবে সে চিন্তাশীল মন অচিরেই বুঝতে সক্ষম হয় যে, সত্যিকার অর্থে একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতা হচ্ছে অসীম। এই মহাবিশ্ব এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর ক্ষমতার বিরাটত্বের বিকাশ বৈ আর কিছু নয়। মূলত সবকিছু আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর অসীম গুণাবলী থেকেই এ জগৎ সৃষ্টি ও পালিত হচ্ছে। একটু গভীরভাবে ভাবলেই এ সত্য ঈমানী হৃদয়ে ধরা পড়বে।

এটা বিজ্ঞানসম্মত সত্য যে, আমরা যে বিশ্বে বাস করছি তা কল্পনাতীতভাবে বিরাট। এর আয়তন সম্পর্কে ধারণা দিতে যেয়ে একটি উপমা উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছি। মনে করুন, এক ফুট সমান এক আলোক বৎসর। আর এক আলোক বৎসর হচ্ছে আলোক রশ্মি এক বছরে যেটুকু পথ পাড়ি দিতে সক্ষম

হয়। সর্বজনস্বীকৃত আলোকের গতি হচ্ছে ১,৮৬,০০০ মাইল প্রতি সেকেণ্ড। এ হিসেবে ১ বছরে যেটুকু দূরত্ব আলোক রশ্নি পাড়ি দেবে তাহলো- ১,৮৬,০০০ * ৮৬,৪০০ (একদিনে যেসংখ্যক সেকেণ্ড আছে) * ৩৬৫ (এক বছরে যতো দিন আছে) = ৫৮,৬৫৬৯,৬০০০০০০ মাইলের পথ। এই মোটা সংখ্যাকে আমরা সংক্ষিপ্ত করে বলতে পারি যে, প্রায় ৫৯ হাজার কোটি মাইলের পথ। এ হচ্ছে এক আলোক বৎসরের অর্থ। এখন এই সংখ্যাকে যেহেতু আমরা একফুট সমান বলেছি, তাহলে বিজ্ঞানের তথ্যানুযায়ী জগতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত কতো ফুট দীর্ঘ রাস্তা হবে? বিজ্ঞান বলছে তা অন্তত ১৪ হাজার মিলিয়ন আলোক বৎসর বা আমাদের ফুটের হিসেবে ১৪ হাজার মিলিয়ন ফুট। অর্থাৎ ১,৪০০ (চৌদ্দ শত) হাজার কোটি ফুট, আর এই পথ পাড়ি দিতে হলে মনে রাখবেন, আপনাকে প্রতিটি সংখ্যা কমাতে এক একটি আলোক বৎসর পার হয়ে যেতে হবে।

এখন চিন্তা করে দেখুন এ মহাবিশ্ব কত বিরাট। এর স্রষ্টা যিনি তাঁর ক্ষমতাও যে কী অসীম- তা এবার আরেকবার চিন্তা করুন। তবে এখানেই ব্যাপারটির শেষ নয়। এই মহাবিশ্বে প্রায় অসীম পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের বস্তু আছে। যেমন, গ্রহ-উপগ্রহ, সূর্য, সৌরমণ্ডল, তারা, তারাজগত, তারা ক্লাস্টার (কয়েকটি তারাজগৎ নিয়ে একেকটি তারাক্লাস্টার ঘটিত), গ্যালাক্সি (লক্ষ-লক্ষ তারা নিয়ে একেকটি গ্যালাক্সি সৃষ্টি হয়েছে) এবং ক্লাস্টার-সুপারক্লাস্টার (একাধিক গ্যালাক্সি নিয়ে ক্লাস্টার ও একাধিক ক্লাস্টার নিয়ে একেকটি সুপারকাস্টার তৈরী হয়েছে)। এই অসংখ্য-প্রায় বস্তুকে মহাপ্রভু সৃষ্টি করেছেন, পরিচালনা-লালন-পালন করছেন। সুতরাং তাঁর ক্ষমতার অসীমত্ব এসব কর্মক্ষমতা থেকে অনুধাবন করা যায়। তবে এর জন্য তাঁর প্রতি ঈমান থাকতে হবে। অবিশ্বাসীরা বলে এসব হচ্ছে প্রকৃতি, স্বভাব বা নেচার। এর পেছনে খোদায়ী কোন শক্তি নেই! কী অদ্ভুত কথা! ঈমানী নূর থেকে বঞ্চিত মানুষ এভাবেই বলে থাকে। যেসব ব্যাপারে অন্য কোন যৌক্তিক জবাব খুঁজে পায় না তখন তারা এরূপই বলে, "এটা হচ্ছে নেচার"। কিন্তু এই নেচারকে যে নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁকে তারা কিছুতেই মানতে রাজী নয়। বাস্তবে মানার জন্য যে পূর্বশর্ত অথাৎ ঈমানী নূর, এটা থেকে তারা বঞ্চিত থাকার কারণে উপরোক্ত অদ্ভুত কথা বলে থাকে। কুরআনে তাই এদেরকে "অন্ধ, বধির, বোবা" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এদের হৃদয়ের উপর একটি দুর্ভেদ্য পর্দা

আছে। এরফলে তারা অন্তর দিয়ে সত্যকে অনুধাবন করতে পারে না। আমরা আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(ঘ) মানবজীবনের রহস্য উদঘাটন

ঈমান সহকারে সৃষ্ট জগৎ নিয়ে ভাবনায় চতুর্থ যে উপকার সধিত হয়, তা হলো জীবনের রহস্য উদঘাটনে সহায়তা। সৃষ্ট জগৎ নিয়ে গবেষণা করতে করতে প্রভুর অনুগ্রহ ও কুদরত অবলোকন শেষে এক পর্যায়ে গবেষক তার নিজের দিকে মনোনিবেশ করে। তার দেহ-মন-প্রাণ আসলে কী, এবং জীবন-মরণের রহস্যাবলী কী- ওসব প্রশ্নসহ গভীর ভাবনায়, সে বিভোর হয়ে উঠে। নিজের পরিচিতি, ইহলোকে আসার অন্তর্নিহিত কারণ প্রভৃতি ব্যাপারে সে সচেতন হয়ে উঠে এবং অবশেষে তার জ্ঞানেন্দ্রিয়তে ধরা পড়ে যে, এ জীবন মূলত আল্লাহকে জানা-চেনার জন্যই। আল্লাহকে চেনার মধ্যেই প্রকৃত ইলম লুক্কায়িত আছে। ঈমান সহকারে আল্লাহর পরিচিতি অর্জনে মানুষ জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে। যাবতীয় দর্শনের মূল এই প্রভু-পরিচিতিতেই নিহিত।

প্রভু-পরিচিতির রাস্তার পথিক ইহ-পরলোকে সুন্দর-সুখী জীবনের অধিকারী হতে পারে। আর এটাই সত্যদর্শন। জাগতিক জীবনে এরূপ প্রভু-অন্বেষী হয়ে ওঠে চারিত্রিক গুলাবলীর অধিকারী এবং ইহ-পারলৌকিক জ্ঞান আহরণ করে সে আত্মিকভাবে শান্তির উৎসও খুঁজে পায়। দর্শন তো প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে চায়, মানবজীবন কল্যাণময় করতে চায়, জীবন-মরণের রহস্য বের করতে চায়, জড়জগৎ ও মানবজগতের মধ্যে এবং প্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে সত্য তথ্য আবিষ্কার করতে চায়। মানবসমাজকে উন্নততর করতে চায়। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে গড়ে তুলতে চায় সুন্দর সংঘাতহীন সুষ্ঠু সামঞ্জস্যতা। দর্শন যদি এসব বিষয় নিয়ে হয়ে থাকে, প্রকৃত সত্যের সন্ধানী হয়ে থাকে, তবে তা যে একামাত্র ঈমনী চিন্তা-চেতনায় নিহিত তা দার্শনিকরা কবে উপলব্ধি করবেন?

উপরোক্ত কিছুটা দীর্ঘ ভূমিকা থেকে পাঠকরা নিশ্চয়ই অনুধাবন করছেন, এই গ্রন্থ রচনার পেছনে কোন্ জিনিষটি আমাকে অনুপ্রেরণা যোগিয়েছে। সে জিনসটি আর

কিছুই নয়- জ্ঞানের পিপাসা। ছোট থেকেই এই সৃষ্টজগৎ ও এর মধ্যে অসংখ্য বস্তু নিয়ে আমি ভাবতাম। ভাবতাম, এসব কী? কেন? আমি কে? প্রভু কে? জগতের অসংখ্য প্রাকৃতিক ঘটনাবলী কেন সংঘটিত হয়? এর পেছনে রহস্য কি থাকতে পারে? ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্ন জাগতো। আমার দৃঢ়-বিশ্বাস এসব প্রশ্ন শুধু আমার মনেই জাগ্রত হয় না, অল্প-বিস্তর সবার মনেই কোন না কোন সময় এসব প্রশ্ন এসে হানা দেয়। আর এ থেকেই মনের মধ্যে জানার স্পৃহা ও এক তীব্র পিপাসা আত্মপ্রকাশ করে। তাই শুরু হলো, সন্ধান।

আলহামদুলিল্লাহ! জীবনের সিংহভাগ সময় থেকে যেটুকু অত্যল্প জ্ঞান আহরণ করার তাওফিক আল্লাহ পাক দান করেছেন সেটুকু এই গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী আমার প্রিয় ভাই-বোনদের সামনে তুলে ধরলাম। আমার এ লেখার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। সুতরাং এ থেকে যদি কেউ সমান্যও উপকৃত হন তবে তা হবে সেই সন্তুটি অর্জনে সহায়ক। আর তার জন্য অবশ্য আমার নিজের গৌরবের কিছুই নেই। প্রশংসার মালিক একমাত্র আল্লাহ পাক সুবহানাহু তা'আলা।

বাংলা ভাষায় ঈমান ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা হয়েছে অত্যল্প। বিশেষকরে বিজ্ঞানের মতো একটি কঠিন বিষয়কে সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন খুব সহজ ব্যাপার নয়। আমি এই গ্রন্থের ভাষা-ব্যবহারে সেদিকে খুব খেয়াল রেখেছি। তবে এটা সর্বসাধারণের বোধমগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে সফল হয়েছে- সে দাবী আমি করবো না। গ্রন্থটি কোন স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসাবেও রচিত নয়। সুতরাং বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের উপর সার্বিক গবেষণা ও টেকনিক্যাল তথ্যাদি অথবা গণিতশাস্ত্রের জটিল সমীকরণের মাধ্যমে ব্যাখা এখানে পাঠকরা পাবেন না। বিজ্ঞান ও ইসলাম যে মূলত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল সেটা পরিষ্কার করা এবং বিজ্ঞানের প্রতি বাংলাদেশী সাধারণ্যের মাঝে কিছুটা হলেও আকর্ষণ সৃষ্টির মাধ্যমে চেতনা জন্মানোও এই গ্রন্থ রচনার একটি উদ্দেশ্য। পাঠকরা যাতে এটা পাঠে আনন্দবোধ করেন সেদিকে যথাসাধ্য খিয়াল রেখেছি।

তিনটি ভিন্ন খণ্ডে গন্থের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক দিক নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা হয়েছে। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান একটু ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ হলো,

বিজ্ঞান যে ইসলামী স্বর্ণযুগের অবদান তা প্রমাণ করা। আমাদের পূর্বসূরী মুসলিম বিজ্ঞানীরা হচ্ছেন আমাদের গৌরব। বিভিন্ন মনীষী বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে সে যুগে বিশ্বকে উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন এক বিরাট জ্ঞানের সম্ভার। আমরা তাঁদের কথা আজ ভুলতে বসেছি। তাঁদের অনুসরণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণা পাশ্চাত্যে প্রায় সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। অথচ বিজ্ঞানচেতনা ছাড়া আজকের ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বশীল বিশ্বে জীবনের মানোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধশীল জাতিগঠন কিছুতেই সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় খণ্ডে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর সারসংক্ষেপ আলোচনা হয়েছে। এ পর্বে যেসব বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে তা পাঠ করে অনুধাবন করতে পারলেই, আশাকরা যায় বিজ্ঞানের মৌলিক বিভিন্ন দিকগুলো পাঠকদের জানা হয়ে যাবে। তবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনায় আমি ইচ্ছে করেই কাঠিন্যতা বর্জন করেছি। অর্থাৎ কোন বিষয়ে গাণিতিক কিংবা টেকনিক্যাল তথ্য গভীরভাবে উপস্থাপন করি নি। এর কারণ হলো, আগেই বলেছি- এই গ্রন্থটি বিজ্ঞানের কোন পাঠ্যপুস্তক নয়। এ খণ্ডে তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বরূপ এবং মৌলিক দিকগুলো বর্ণিত হয়েছে।

শেষ খণ্ডে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে ইসলামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। এ খণ্ডটির বেশিরভাগ কথা আমার নিজের। সুতরাং এখানে ভুল-ত্রুটির মাত্রা অতিরিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই পর্ব আমি একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে বদ্ধমূল রেখে উপস্থাপন করেছি- তাহলো, বিজ্ঞান ও ঈমানের মধ্যে সম্পর্ক কি? আমি আশাকরি এই শেষ পর্বটি পাঠ করে অনেকে আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, বিজ্ঞান আসলে ঈমানবৃদ্ধির জন্য সহায়ক-শক্তি। বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শী মানুষ ঈমানী শক্তিতে দৃঢ় হতে বাধ্য। অর্থাৎ ঈমানদারদের জন্য বিজ্ঞানী হওয়া আল্লাহ-প্রদত্ত এক বিরাট নিয়ামত। এরূপ বিজ্ঞানী বৈষয়িক উন্নয়নে মানবজীবনের ইহলৌকিক মানোন্নয়ন যেমন করে থাকেন তেমনি তিনি নিজেও ঈমানী শক্তির ফলে আল্লাহর নৈকট্যশীল ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারেন।

সবশেষে আবারও আল্লাহর পবিত্র দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং এই বড় গ্রন্থটি রচনায় যারা আমাকে সার্বিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের

সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখানে কয়েকজন বিশিষ্ট গুণিজনের নাম উল্লেখ না করলে নিজেকে অপরাধী হিসেবে অনুভব করবো।

আমার বাবা আলাহজ্জ আলী আসগর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আমার আম্মা মুছাম্মত মমরাজ বিবি, আমার স্ত্রী ও সন্তানাদি যাদের মধ্য থেকে আমি পেয়েছি অফুরন্ত প্রেরণা। এছাড়া যে কম্পিউটার দিয়ে এ গ্রন্থটি কম্পোজ করেছি তা আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী মুছাম্মত মমতাজ বেগম উপহার হিসেবে আমাকে দিয়েছিল। আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

গুণিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে স্মরণ করছি মাসিক মদীনা সম্পাদক জ্ঞানতাপস মাওলানা মুহিউদ্দীন খান দামাত বারাকাতুহুম, লন্ডন থেকে প্রকাশিত মাসিক ইসলামী সমাচার ও সাপ্তাহিক হিজরত সম্পাদক বন্ধুবর কবি আবদুল মুকিত মুখতার, সাপ্তাহিক হিজরতের সহকারী সম্পাদক কলামিস্ট বন্ধুবর দেওয়ান শামসুল হুদা চৌধুরী, বন্ধুবর ক্বারী মাওলানা উবাইদুল্লাহ আমিনী, আলহাজ্জ হাফিজ ফরহাদ আহমদ আমিনী, আলহাজ্জ মুফতি মনজুর রশীদ আমিনী, সহকর্মী ও বন্ধুবর মাওলানা জালাল উদ্দীন, লেখিকা ও একান্ত আত্মীয়া হুসনুল আম্বিয়া চৌধুরী প্রখুম। এদের সবার উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং সহযোগিতা ছাড়া এই গ্রন্থটি হয়তো কোনদিন লেখা হতো না। এছাড়া অন্যান্য অনেক বন্ধু-বান্ধবের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

সধারণ মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। নিশ্চয়ই আমারও অনেক ভুল হয়েছে। সুহৃদ পাঠকদের চোখে যদি কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তবে অনুগ্রহ করে আমাকে অবগত করতে দ্বিধা করবেন না। আমি এজন্যে আপনাদের কাছে ঋণী থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আমি আশাকরি বইটি পাঠ করে একদিকে যেমন আপনি আনন্দ পাবেন তেমনি উপকৃতও হবেন।

বিনীত
ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
সিলেট, রামাদ্বান ১৪৩২ হিজরী, আগস্ট ২০১১ ঈসায়ী।

"আমি (আল্লাহ) আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যাকিছু আছে এসব কৌতুক হেতু সৃষ্টি করি নি" [সূরা দুখান ঃ ৩৮]।

ইতিহাসের আলোকে বিজ্ঞান

পরিচ্ছেদ ১

সৃষ্ট জগত, মানুষ ও বিজ্ঞান

এ মহাবিশ্ব একটি বস্তু জগত। এর প্রতিটি অনুকণা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত কিছু মৌলিক আইনের আওতাভূক্ত থেকে অস্তিত্বশীল আছে। সমগ্র জগতটি একটি ফিজিক্যাল বাস্তবতা। এর মধ্যে প্রতিনিয়ত রদবদল ঘটছে। সৃষ্টির শুরুতে এ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে এবং তা শেষ অবধি অব্যাহত থাকবে।

সৃষ্ট এই মহাবিশ্বের এক অংশ সৌরমণ্ডল নামক একটি জগতে নীল রংয়ের ভাসমান এক গ্রহের মধ্যে মানুষ নামক সৃষ্টির সেরা জীবীর বসবাস। জগতের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায় এই মানবসন্তানের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক বিরাট শক্তি। এই শক্তির বহিঃপ্রকাশ থেকেই তার মনে জাগ্রত হয় অসংখ্য প্রশ্ন। জানার পিপাসায় সে সর্বদাই ব্যকুল। দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান জগতের কার্যকারিতা, এর বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, জন্ম-মৃত্যু-জীবনের রহস্য প্রভৃতি হাজারো প্রশ্ন তার মনে দোলা দেয়। সে জানতে চায়, বুঝতে চায়, জ্ঞানবান হতে চায়। মানুষের এই অনুসন্ধিৎসু মনের স্পৃহা থেকেই সুদূর অতীতে প্রণালীবদ্ধভাবে জানার একটি জ্ঞানের শাখার জন্ম নেয়। এই জ্ঞানের শাখার নামই হচ্ছে বিজ্ঞান।

'বিজ্ঞান' শব্দটির ইংজেরী প্রতিশব্দ 'সায়েন্স'। সায়েন্স শব্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সায়েন্স হচ্ছে সার্বিকভাবে বিশ্বজগৎ নিয়ে প্রণালীবদ্ধভাবে গবেষণা চালিয়ে জ্ঞানার্জন করার নাম। এখানে 'প্রণালীবদ্ধভাবে' কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বিজ্ঞান এমন একটি বিষয় যে, সত্যিকার অর্থে যে কোন তথ্যকে 'বৈজ্ঞানিক তথ্য' হিসেবে গ্রহণ করার আগে বিজ্ঞানের কিছু টেস্ট এসব তথ্য পাশ করে আসতে হবে। অর্থাৎ মৌলিক কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার

নিরিখে প্রাপ্ত তথ্য সঠিক কি না তা যাচাই করে এর সত্যতা প্রমাণিত না করা পর্যন্ত কথিত তথ্যকে বৈজ্ঞানিক সত্য বা ফেক্ট বলা যাবে না। এই 'সিস্টেমেটিক' শিক্ষাপদ্ধতিই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মেথোড বা প্রাণালী।

আজ থেকে প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে সভ্যতার উন্মেষ ঘটে মেসোপটামিয়া (বর্তমান ইরাক) এবং নীল নদের তীরবর্তী প্রাচীন মিশরে। এসব সভ্যতার লীলাভূমিতেই সর্বপ্রথম প্রণালীবদ্ধভাবে জগৎ ও এর বিভিন্ন দৃশ্যমান কার্যকারিতা সম্পর্কে জানার উদ্ভাবন ঘটে। মানুষ পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে বিভিন্ন ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার কারণ জানার উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রচীন সে যুগে কিভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে এর উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল সেব্যাপারে এবার বিস্তারিত আলোচনা করে দেখা যাক।

প্রাচীন যুগে বিজ্ঞান

প্রাথমিকভাবে অবশ্যই, মানবিক সাধারণ প্রয়োজনীতা পূরণে বৈজ্ঞানিক চেতনার জন্ম হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার সময় সময় জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। যেমন- অতি সাধারণ হিসাব-নিকাশের জন্য অঙ্ক, জমির মাপ-জোখের জন্য জ্যামিতির চিন্তা-ভাবনা এবং বিভিন্ন মৌসুম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনচলার জন্যে জরুরী বিষয়। এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং, সময় নির্ণয়, চাষাবাদ প্রভৃতি কাজের জন্যও কিছু মৌলিক প্রণালী আবিষ্কারের প্রয়োজন দাঁড়ায়। অপরদিকে মানুষ সর্বদাই রোগ-শোকে ভুগে এবং কর্মক্ষেত্রে বা জীবনচলার যে কোন সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে নিজেকে আহত-বিক্ষত করতে পারে। সুতরাং মানুষ তার নিজের শারীরিক নিরাপত্তা ও রোগ-ব্যধি থেকে আরোগ্য লাভের আশায় আদি কাল থেকেই 'নিরাময়' খুঁজে আসছে। এ মৌলিক প্রয়োজনীয়তা থেকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্ম।

মোসোপটামিয়ার বেবিলন ও আসিরিয়ার মানুষ সর্বপ্রথম জ্যোতিষশাস্ত্র (এটা জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কহীন, বাস্তবে জ্যোতিষশাস্ত্র কোন বিজ্ঞান নয়) ও সংখ্যা শাস্ত্রের জন্ম দেয়। দেখা গেছে এসময় বেবিলনের গাণিতিকরা সাধারণ যোগ-বিয়োগ-ভাগ-পূরণ ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে বীজগণিতের সাধারণ

সমীকরণ নিয়েও গবেষণা করেছেন। অবশ্য এসব কর্মতৎপরতার পেছনে মূলত প্রাকটিক্যাল সমস্যাবলীর সমাধান খুঁজে বের করাই ছিলো তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য।

প্রচীন গ্রীকপূর্ব যুগে মিশর, মেসোপটামিয়া, ভারত প্রভৃতি অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা মূলত বাস্তব ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তার উপরই নির্ভর ছিলো। তবে ভারতবর্ষে পরবর্তীতে লিখিত যে সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছিলো তা সমগ্র বিশ্বব্যাপী আজও প্রচলিত আছে। এ ব্যাপারে পরে আলোচনা হবে।

গ্রীক বিজ্ঞান

যুক্তি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গভীর গবেষণার মাধ্যমে জগতকে জানার পদ্ধতিগত বিজ্ঞানের উদ্ভাবক গ্রীকরাই ছিলেন। এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন না। বেবিলন ও মিশরে যেখানে বিজ্ঞান ছিলো মূলত মানবিক প্রয়োজনীয়তার সম্পূরক, কিন্তু গ্রীকদের নিকট তা ছিলো জানার গভীর স্পৃহা। জগতকে জানার এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই প্রাচীন গ্রীসে বিজ্ঞানচেতনা ব্যাপকভাবে জাগ্রত হয়। এই জাগরণের অগ্রপুরুষ ছিলেন মিলেটাসের থেলিস (খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক) নামক এক ব্যক্তি। একজন বণিক, যিনি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দির শুরুতে বিজ্ঞানের জন্যে নিজের ব্যবসা থেকে ইস্তিফা দেন। থেলিস হয়তো তখনকার যুগের সভ্যতার লীলাভূমি বেবিলন ও মিশরে ভ্রমণ করেছেন এবং সেসব জায়গার গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞানার্জন করে এসব ধারণা গ্রীক বিজ্ঞানে এনে সম্পৃক্ত করেন। বিশ্বতত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনিই সর্বপ্রথম স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনার সূত্রপাত ঘটান। তার ধারণা ছিলো জগতের মৌলিক উপাদান হচ্ছে পানি। পানি থেকেই সবকিছু সৃষ্ট।

বিশ্বজগৎ নিয়ে গবেষণায় থেলিসের পদ্ধতি অনুসরণ করে পরবর্তী ২ শতকের গ্রীক বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন থিওরী তুলে ধরেন। জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে সক্রেটিস-পূর্ব যুগের চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা অনেক ধরণের কথা বলেছেন। তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, তারা দার্শনিক প্রশ্নদ্বয় 'অস্তিত্ব' ও 'পরিবর্তনশীলতা' নিয়ে সংলাপ শুরু করেন। এসব প্রশ্নের প্রবক্তা ছিলেন হিরাক্লিটাস (খ্রি.পূ. ৫৪০-৪৮০) ও পারমেনাইডিস (জন্মঃ খ্রি.পূ. ৫১৫)। একদিকে তারা একটি অনন্তকাল অপরিবর্তনীয় জগতকে দেখেন অথচ অপরদিকে এই জগতের আভ্যন্তরে অসংখ্য

পরিবর্তন ঘটছে। এই আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী অবস্থানের মৌলিক রদবদল ঘটে ডিমোক্রিটাসের (খ্রি.পূ. ৪৬০-৩৭০) মাধ্যমে। তিনি 'এটমের' ধারণার জন্ম দিয়ে জাগতিক পরিবর্তনশীলতার ব্যাখ্যা দেন। বলাই বাহুল্য প্রাথমিক এই এটোমিক ধারণা আজও বিজ্ঞানমহলে বহাল আছে। তবে ডিমোক্রিটাসও সার্বিকভাবে এ বিশ্বকে একটি অপরিবর্তনীয় অনন্ত জগৎ মনে করতেন। এটোমিক রদবদল এই মহাবিশ্বের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ উৎকর্ষ সাধনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন গণিতবিদ পিথাগোরাস (খ্রি.পূ. ৫৪০-৫০০)। তিনি একটি সংখ্যা থিওরীর উদ্ভাবন করেন। এর মাধ্যমে শুধু অঙ্কশাস্ত্র নয় বিশ্বতত্ত্বের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীদের মধ্যে নতুন চেতনা সৃষ্টি হয়। সক্রেটিস-পূর্ব বৈজ্ঞানিক চেতনায় একটি জিনিস অনুপস্থিত ছিলো- তাহলো চিন্তাবিদরা জগৎ নিয়ে ভেবেছেন ঠিকই কিন্তু মানুষ যে এই সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু সেদিকে খেয়াল তাদের ছিলো না। এই নতুন দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার উদ্ভাবক ছিলেন সক্রেটিস (খ্রি.পূ. ৪৭০-৩৯৯)। তার মতে জগৎ নিয়ে বেশী গবেষণার চেয়ে মানবিক চিন্তাচেতনার মৌলিক উদ্দেশ্য হতে হবে সত্যকে খুঁজে বের করা, সঠিক ন্যায়নিষ্ঠতা এবং চারিত্রিক সৌন্দর্য কিভাবে উন্নততর করা যায় সেদিকে খেয়াল দেওয়া। এসব লক্ষ্য অর্জনে সক্রেটিস শক্তিশালী সংলাপভিত্তিক যুক্তিবিদ্যার জন্ম দেন। যদিও আপাতদৃষ্টিতে সক্রেটিসকে আমরা বিজ্ঞানবিরোধী মানবতাবাদী বলতে পারি কিন্তু তার যুক্তিতর্কভিত্তিক গবেষণা মোটেই অবৈজ্ঞানিক কিছু নয়। বরং পরবর্তীতে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে এরূপ পদ্ধতিই বেশী ব্যবহৃত হয়েছে।

সক্রেটিসের ছাত্র ও একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা প্লেটোও (খ্রি.পূ. ৪২৮-৩৪৭) সক্রেটিসের চিন্তা-চেতনাকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু তিনি গণিতশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং সত্যতা মেনে নিলেও সক্রেটিসের মতো দার্শনিক চিন্তা-ভাবনাই তাকে বেশী আড়ষ্ট করে রাখে।

একাডেমী থেকে বেরিয়ে আসা সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন, এ্যারিস্টটল (খ্রি.পূ. ৩৮৪-৩২২)। তার পূর্বসূরী সক্রেটিস ও প্লেটোর মতো তিনিও সঠিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সত্যিকার জ্ঞানের সন্ধানী ছিলেন। তবে তার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবধান ছিলো- তাহলো, যুক্তির মানদণ্ডে কোন সত্যপ্রতিষ্ঠায় থিওরী বা

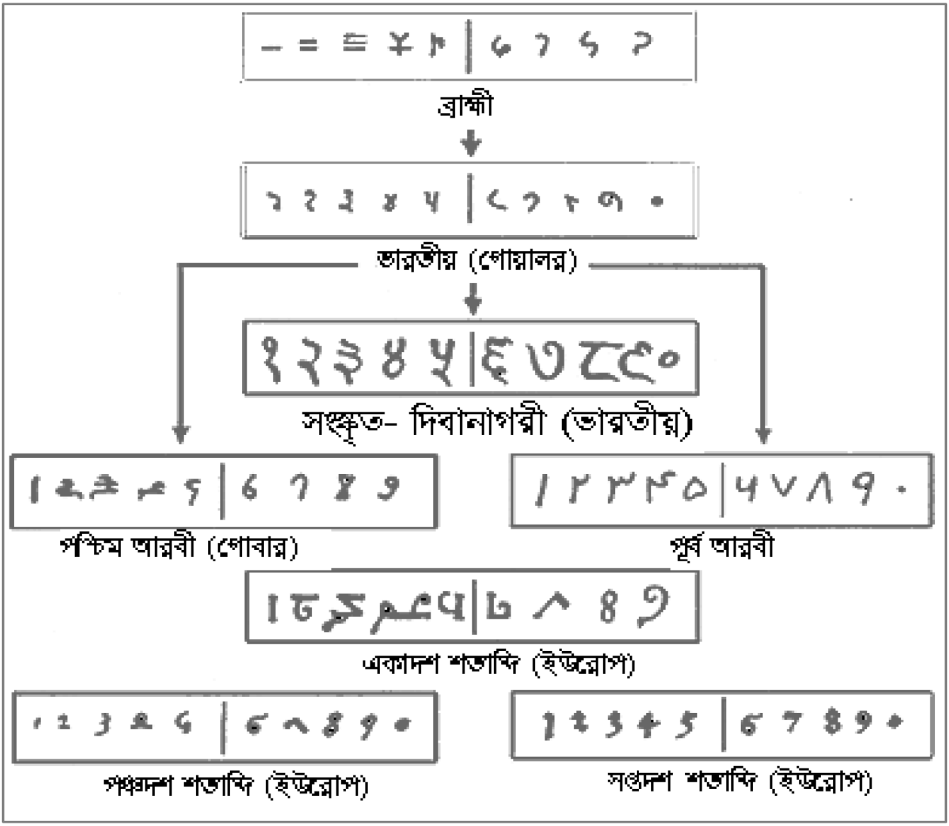
বুদ্ধিসম্পন্ন ধারণার ব্যবহার। অর্থাৎ প্রথমে ধারণা করে কিছু থিওরী তুলে ধরা এরপর এর সত্যতা যুক্তির মাধ্যমে যাচাই করা। এই পদ্ধতির মাধ্যমেই পরবর্তীতে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়। কোন নেচারেল বা প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাপারে বিজ্ঞানী একটি থিওরী সৃষ্টি করেন, এরপর এটা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা- যেমন অঙ্কশাস্ত্রের ব্যবহার কিংবা পর্যবেক্ষণমূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে থিওরীর সত্যতা যাচাই করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা। গ্রীক বিজ্ঞানের এই দিকটিই স্থায়ী প্রভাব ফেলে। এছাড়া ইউক্লিড (জন্মঃ খ্রি.পূ. ৩০০), পিথাগরাস (খি.পূ. ৫৮০-৫০০) প্রমুখ গণিতশাস্ত্রকে পৃথিবীর বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

আলেকজান্দ্রিয়ায় বিজ্ঞানচেতনা

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে প্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিস্তারলাভ করে। ক্রমান্বয়ে প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে বিজ্ঞানচর্চার চরম উৎকর্ষ শুরু হয়। তখন থেকে বিজ্ঞান গবেষণার দীর্ঘস্থায়ী প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় এই আলেকজান্দ্রিয়া শহর। এমনকি গ্রীক রাজধানী এথেন্স থেকেও এই গবেষণাকেন্দ্র আরও প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। এর বিশেষ একটি কারণ হলো- আলেকজান্দ্রিয়ায় তখনকার যুগের বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ একটি পাঠাগার স্থাপিত হয়েছিল। এখানেই প্রসিদ্ধ জ্যামিতিবিদ ইউক্লিড (খ্রি.পূ. ৩য় শতক) তাঁর জগতখ্যাত গ্রন্থ ‘ইলেমেন্ট’ রচনা করেন। এছাড়া বিজ্ঞানী এ্যাপোলোনিয়াস অব পেরগা (২৪০-১৯০ ঈ.) এবং এ্যারিস্টারকাস অব সামোস (৩১০-২৩০ ঈ.) এই শহরেই বিজ্ঞানের উপর গবেষণা চালান। তবে ইউক্লিড ছাড়াও আলেকজান্দ্রিয়ার অপর প্রসিদ্ধ যে বিজ্ঞানীর থিওরী বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করেছিল তাঁর নাম হলো ‘টলেমি অব আলেকজান্দ্রিয়া’ (১০০-১৭০ ঈ.)। তাঁর লিখা জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো ‘আলমাজেষ্ট’। বইয়ের এই নামটি হচ্ছে আরবি নাম। এটা পরবর্তীতে মুসলমানরা আরবি ভাষায় এই নামেই প্রকাশ করেছিলেন।

রোমানরা যদিও গ্রীক কৃষ্টি-ঐতিহ্য থেকে প্রভাবিত হয়েছিল কিন্তু বিজ্ঞানচেতনায় তারা ছিলো অত্যন্ত অনাগ্রহী। বাস্তবে রোমানরা ছিলো একটি মিলিটারী শাসক জাতি। বিজ্ঞানের উৎকর্ষে তাদের ভূমিকা অবিশ্বাস্যভাবে কম ছিলো। গ্রীক

অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তারা মোটেই তেমন তোয়াক্কা করে নি। তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু মননের অভাব ছিলো বলেই মনে হয়। তবে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাদের অবদান অবশ্যই আছে। বড় বড় শহর নির্মাণ থেকে মিলিটারী শক্তিগঠন ও শক্তিশালী যুদ্ধাস্ত্র তৈরীতে এ জাতি ছিল পারদর্শী। এসব কার্য সমাধানে প্রযুক্তি বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন ছিলো।



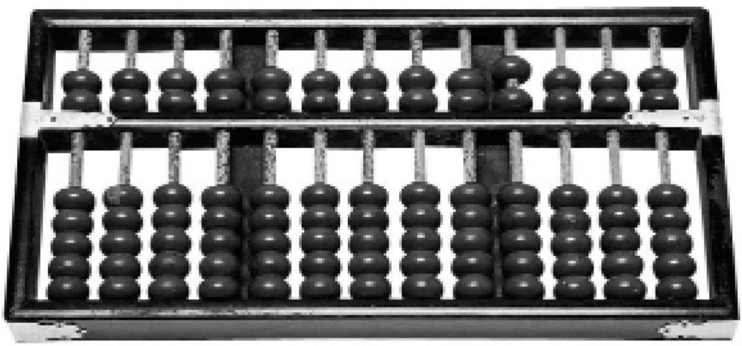
চিত্র ১: প্রাচীন ভারতে আবিষ্কৃত সংখ্যা সিস্টেম যা আজো ব্যবহৃত হচেছ।

রোমান বিজ্ঞানীদের মধ্যে জ্ঞানের উপর গবেষক ভার্‌রো (খ্রি.পূ. ১১৬-২৭), প্রাকৃতিক ইতিহাসের উপর লেখক প্লিনি দ্যা এল্ডার (২৩-৭৯ ঈ.), এ্যানাটমী ও ঔষধ বিজ্ঞানের গবেষক গ্যালেন (১৩০-২০০ ঈসায়ী সাল- তিনি ছিলেন

বংশগতভাবে গ্রীক), স্রাবো অব পন্টাস (৬৩ খ্রি.পূ- ২১ ঈ.) এবং স্পেনিশ বংশোদ্ভুত পম্পোনিয়াস মেলা (জন্ম: ৪৩ ঈ.) প্রমুখের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দু'জন রোম শহরে কর্মরত ছিলেন। তারা ভূগোলের উপর গবেষণা করেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান

প্রাচীন যুগে ভারতীয় বিজ্ঞানের গতিধারা ছিলো স্বতন্ত্র। খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দির আগেই কিন্তু মেসোপটামিয়া ও গ্রীক বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রসার ঘটতে থাকে ভারতীয় সভ্যতায়। ইতোপূর্বে হিন্দুদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু ছিলো ক্যালেন্ডার সিষ্টেম। এছাড়া হিন্দু পুরোহিতরা তখনই গ্রীক থেকে ধারকরা জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তবে এ শাস্ত্রটির সঙ্গে সত্যিকার বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সুদূর মহাকাশে অবস্থানরত তারাদের সাথে সম্পর্ক আছে বলে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি। যা হোক, শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে ভারতে সত্যিকার বিজ্ঞানচর্চা আরম্ভ হয় এবং ভারতীয় বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞানের মৌলিক শাখাগুলোর উপর গবেষণায় লিপ্ত হন। বিশেষকরে হিন্দুরা অঙ্ক শাস্ত্রে সে সময় প্রভুত উন্নতি সাধন করেন। তাদের আবিষ্কৃত সংখ্যা সিষ্টেম আজও বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হচ্ছে। যদিও পশ্চিমে এই সংখ্যাকে 'আরাবিক' বলা হয়ে থাকে- এর কারণ হলো, মুসলমানরা এই সিস্টেমটি পরবর্তীতে পাশ্চাত্যে (ইউরোপে) পরিচিত করেছিলেন।



চিত্র ২: চীনে আবিষ্কৃত প্রথম 'কালক্যুলেটর' আবাকাস।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন যে, আসমান ও যমীনের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই" [সূরা আলে ইমরান ঃ ৫]।

পরিচ্ছেদ ২

মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞানচর্চা

প্রাচীন যুগের ইতি ঘটিয়ে প্রথিবীর বুকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি সভ্যতা ও ধর্মের জন্ম হয় ঈসায়ী সপ্তম শতকে। এই মহান ধর্মভিত্তিক সভ্যতার নাম হচ্ছে ইসলাম। বিজ্ঞানের ইতিহাসের উপর আলোচনায়- মুসলমানদের সোনালী যুগের বৈজ্ঞানিক চেতনারই সুফল আজকের বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগ বিবেচনায়, এ প্রসঙ্গে মুসলিম বিজ্ঞানীদের বিরাট অবদানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। পাঠকরা মুসলামদের বৈজ্ঞানিক চেতনার ব্যাপকতা উপলব্ধি করে বুঝতে পারবেন, সে যুগের আমাদের পূর্বসুরীরা এ যুগের আমরা মুসলমানদের তুলনায় কতো এডভান্স ছিলেন। এছাড়া তাঁদের বৈজ্ঞানিক অবদান থেকে সমগ্র পৃথিবী কতটুকু উপকৃত হয়েছে তা সহজেই ধরা পড়বে।

৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৮ই জুন আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর ইন্তিকালের কিছুদিনের মধ্যেই সমগ্র আরব জাতিসহ, পারস্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর, জিব্রালটার ও স্পেন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মুসলিম উম্মার মধ্যে একত্রিত হয়। সাথে সাথে ইসলামী একটি নবতর সভ্যতার জন্ম হয় যা আজো স্থায়ী আছে।

মুসলমান আরবরা দ্রুত তাদের দ্বারা শাসিত নতুন নতুন জাতিদের ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হন ও শিক্ষা গ্রহণ করেন। একই সময় ইসলামে দীক্ষিত অনারবদের অনেকেই কুরআনের ভাষা, আরবিকে গ্রহণ করে নেয়। পারস্য, সিরিয়া, বারবার এবং অন্যান্য জাতি আরবি ভাষাকে নিজস্ব ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরই আরবরা সব ধরনের শিক্ষার্জনে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সমগ্র ইসলামী বিশ্বে অচিরেই গড়ে ওঠে অসংখ্য বিদ্যাপীঠ, কলেজ, লাইব্রেরী, অবজারভেটরী (মহাকাশ পর্যবেক্ষণকেন্দ্র) ও হাসপাতাল। একই সাথে তখনকার দিনের জ্ঞানার্জনের প্রসিদ্ধ দু'টি শহর দামেস্ক ও বাগদাদে রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান থেকে বিশিষ্ট পণ্ডিতদেরকে নিমন্ত্রিত করে আনা হয়। এ ক্ষেত্রে পণ্ডিতদের নিজস্ব ধর্ম, জাতিগত পরিচিতি বা ঐতিহ্যের উপর কোন ধরনের বিবেচনা না করে যারতার যোগ্যতার উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। নবাগত পণ্ডিতরা দক্ষতার সাথে ও শাসকদের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থেকে তখন গ্রীক-বিজ্ঞানের অনেক বই-পুস্তক, আলোচনা-সমালোচনা-মতামত সহকারে আরবিতে ভাষান্তর করেন।

অতএব, এর ফলস্বরূপ পুরাতন ও নতুন বৈজ্ঞানিক ধারণার জন্ম নেয়, এবং সাধারণ মুক্ত-বুদ্ধিসম্পন্ন মরুবাসীদের হৃদয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চেতনা জাগ্রত হয়ে ওঠে। তবে এ নবজাগরণের পেছনে বিশ্বজগৎ নিয়ে গবেষণা করার কুরআনী নির্দেশনাবলী বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলো তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রাথমিক দিনগুলোতে মুসলমানরা জ্ঞানার্জনের অন্বেষণে বাগদাদকে তখনকার বিশ্বের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলেন। বাগদাদের শিক্ষাকেন্দ্র সম্পর্কে ইতিহাসবিদরা সঠিকই বলেছেন যে, উহা বৈজ্ঞানিক চেতনায় উজ্জীবিত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিলো।

জানা থেকে অজানার পথে পাড়ি দিয়ে বিজ্ঞানের নতুন বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাকে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করেন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা ভূয়োদর্শন ব্যতীত কিছুই ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করতে রাজী হন নি। এসব মৌলিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিমূলক বিষয়-বস্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বাগদাদেই শিক্ষা দেওয়া হয়। বিজ্ঞানে ইসলামের অবদানের ইতিহাস তাই অষ্টম শতাব্দির এ বাগদাদ নগরী থেকেই শুরু করা আবশ্যক। জর্জ সারটন তাঁর ইনট্রোডাকশন টু দ্যা হিস্টরি অব সাইন্স গ্রন্থে অষ্টম শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধ হতে একাদশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত সময়কে নিম্নোল্লিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ

(ক) জাবির ইবনে হাইয়ান এর সময়, যা অষ্টম শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত।
(খ) আল-খোওয়ারিজমির কাল, যা নবম শতাব্দির প্রথমার্ধে স্থায়ী ছিলো।
(গ) আর-রাজির সময়, যা নবম শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে স্থায়ী ছিলো।
(ঘ) আল-মাসুদের সময়, যা দশম শতাব্দির প্রথমার্ধে বিস্তৃত ছিলো।
(ঙ) আবু-ই-ওয়াফার কাল, যার কার্যকাল দশম শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে স্থায়ী ছিলো।
(চ) আল-বিরুনির সময়, যা ছিলো একাদশ শতাব্দির প্রথমার্ধে স্থায়ী।
(ছ) সবশেষে উমর খৈয়ামের কার্যকাল, যা একাদশ শতাব্দির শেষার্ধে স্থায়ী ছিলো।

এ প্রসঙ্গে ধারাবাহিকভাবে মুসলিম ইতিহাসের স্বর্ণযুগে মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদানের কথা পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখিত যে কোন বিজ্ঞানী সম্পর্কে পাঠকরা ইচ্ছা করলে বিভিন্ন সূত্র থেকে আরও জানতে পারবেন।



চিত্র ৩: মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বে বহুলব্যবহৃত 'অ্যাস্ট্রলেব' যন্ত্র।

(ক) জাবির ইবনে হাইয়ানের কার্যকাল

ধর্মের সঙ্গে সংঘাতহীন নিষ্কলুষ মুক্ত-চিন্তার বিকাশের ফলে মুসলমানরা বৈজ্ঞানিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন, অষ্টম শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধের সময়। এ সময়কেই ইসলামী বিজ্ঞানের সূচনাকাল বলা চলে। জাবির ইবনে হাইয়ান এ সময় বিজ্ঞানের উপর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। জাবিরের লিখিত আরবি বা লেটিন পুস্তকাদি থেকে এটা ভাল করে অনুধাবন করা যায় যে, তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ছিলো অগাধ।

এ সময় দু'জন আব্বাসী খলিফা তাঁদের ক্ষমতা ব্যবহার করেন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নয়ন ও মঙ্গলের জন্য। এ দু'জনের মধ্যে প্রথমজনের নাম হলো বাগদাদের প্রতিষ্ঠাতা, খলিফা আল-মনসুর (৭০৯-৭৭৫ ঈ.) ও দ্বিতীয়জনের নাম, খলিফা হারুন-উর-রশিদ (৭৬৩-৮০৯ ঈ.)। এ দু'জন খালিফাই গ্রীক বিজ্ঞানীদের বই-পুস্তক ভাষান্তর করার লক্ষ্যে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

খলিফা আবু জাফর আব্দুল্লাহ আল-মনসুর ৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে মক্কার নিকটবর্তী বীর মায়মুন নামক স্থানে ৬৮ বছর বয়েসে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আব্বাসী খলিফাদের মধ্যে দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন এবং তাঁর শাসনকাল ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর অবদান অতুলনীয়। এই জ্ঞানবান খলিফার প্রচেষ্টায় অনেক সিরিয়াক, পারস্য, গ্রীক ও হিন্দুদের বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের উপর লিখিত বই-পুস্তক আরবিতে ভাষান্তরিত হয়।

খলিফা হারুন-উর-রশিদের জন্ম হয় ৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে আল-রায় নামক স্থানে। ৮০৯ খ্রিস্টাব্দে তুস নামক স্থানে তাঁর মৃত্যু হয়। হারুন-উর-রশিদ ছিলেন আব্বাসী খলিফাদের মধ্যে পঞ্চম খলিফা এবং হয়তবা আব্বাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধও। তিনি বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর নির্দেশে আরও বহু মূল্যবান গ্রীক পুস্তকাদি ভাষান্তর করা হয়েছিলো। ৮০৭ খ্রিস্টাব্দে হারুন-উর-রশিদ ফরাসীদের বাদশাহ শারলেমেইনকে একটি সুন্দর পানির-ঘড়ি উপহার দেন।

এ সময়ে যাবতীয় গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধীয় গবেষণা একমাত্র মুসলমান বিজ্ঞানীরা করে আসছিলেন। এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, ইতোপূর্বে গণিত শাস্ত্রের উপর চীনা বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অবশ্য গণিতের উপর মুসলমানদের আগ্রহ জন্মে ভারতবর্ষ থেকে সংগ্রহিত গাণিতিক বই-পুস্তকের কারণে। ইব্রাহিম আল-ফজরীই ছিলেন প্রমথ মুসলিম বিজ্ঞানী যিনি অ্যাস্ট্রলেব নামক সমুদ্রে চলার নাবিগেশন যন্ত্রটি তৈরী করেন। হিন্দুদের গণিত শাস্ত্রের সাথে যাঁরা প্রথমে জড়িত হন তাঁদের মধ্যে, ইয়াকুব ইবনে-তারিক ও মুহাম্মদ আল-ফজরী (ইব্রাহিম আল-ফজরীর পূত্র), এঁদের নাম শোনা যায়।

কানকাহ নামক একজন হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সাথে ইয়াকুবের সাক্ষাৎ ঘটে খলিফা আল-মনসুরের দরবারে। যার ফলে হিন্দু গণিত শাস্ত্র ‘সিদ্ধান্ত’ এর সাথে তাঁর পরিচিতি ঘটে। খলিফা তারপর এ বইটিকে আরবিতে ভাষান্তর করার জন্য মুহাম্মদ ইবনে আল-ফজরীকে নির্দেশ দেন। একই সময় চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী আল-বাতরিক আলেকজান্ড্রিয়ার প্রখ্যাত গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি এঁর বই ‘কোয়াড্রিপারটিয়াম’ আরবিতে ভাষান্তর করেন। দু’জন জ্যোতিষী- একজন ইহুদি যাঁর নাম ছিলো, মাশাল্লা ও অপর আরেকজন পারস্য দেশীয় যাঁর নাম ছিলো, আল-নৌবখত, একত্রে কাজ করেন বাগদাদ শহরকে গড়ে তুলতে।

ইব্রাহিম আল-ফজরী

এই বিজ্ঞানীর সাথে ইতোমধ্যে আমরা পরিচিত হয়েছি। ৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে ইব্রাহিম আল-ফজরী মৃত্যুবরণ করেন। আল-ফজরী একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে একাধিক বই লিখে গেছেন, এবং একটি প্রখ্যাত কছিদা বা কবিতাও তিনি লিখেছিলেন যেটির বিষয়বস্তু ছিলো রাশিচক্র।

ইয়াকুব ইবনে তারিক

ইতোমধ্যে এই বিজ্ঞানী সম্পর্কেও বলেছি। তাঁর সময়ে সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত ইয়াকুবের জন্মস্থান হলো পারস্যে। ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৭৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি কর্মরত ছিলেন এবং ৭৯৬

খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। ইয়াকুব ভূগোলক সম্পর্কে লিখেছেন এবং হিন্দু গ্রন্থ সিদ্ধান্তে প্রকাশিত গাণিতিক টেবিলের উপরও লেখালেখি করেন।

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আল-ফজরী

তিনি বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফজরীর পুত্র। পিতা ও পুত্রের প্রায় একই নাম থাকায় কোন কোন সময় ভুলবশতঃ কে কি ছিলেন বা করেছেন সে ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, প্রখ্যাত রাশিচক্রের উপর লিখিত কবিতার লেখক (যেটা সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলেছি) মুহাম্মদ ফজরী ছিলেন, তাঁর পিতা আল-ফজরী নন। তবে এই মুসলমান বিজ্ঞানীই যে খলিফা আল-মনসুরের নির্দেশে সিদ্ধান্ত বইটি আরবিতে ভাষান্তর করেছিলেন, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। ৭৭২ থেকে ৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি এ কার্য সমাধা করেন। ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত নাম্বার সিষ্টেম যা আজো মানুষ ব্যবহার করছে, মুহাম্মদ ফজরীর এ ভাষান্তরের ফলেই ইসলামী বিজ্ঞানে প্রবেশ করে। মুহাম্মদ আল-ফজরী ৭৯৬ থেকে ৮০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনও এক তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

মাশাল্লাহ

তাঁর প্রকৃত নাম হয়ত মানাশিহ (আরবিতে, মিশাহ) ছিলো। লেটিন ভাষাবিদরা তাঁর নাম মেছাহালা, মাসেলামা ও মাসেলারমা প্রভৃতিতে রূপান্তরিত করেছেন। মাশাল্লাহ অবশ্য আরবি 'মা-শাআল্লাহ' কথার একটি সংকোচিত রূপ, যার অর্থ হলো, কি বিস্ময় আল্লাহর অভিপ্রায়!

মাশাল্লাহ খলিফা আল-মনসুরের সময়ে জীবিত ছিলেন এবং ৮১৫ থেকে ৮২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ইসলামের একজন প্রাথমিক পর্যায়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও জ্যোতিষী ছিলেন মাশাল্লাহ। অথচ তিনি ইহুদি ধর্মাবলম্বী একজন মিশরীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর লিখিত একটি মাত্র আরবি বইয়ের খবর পাওয়া যায়, তবে তিনি লেটিন ও হিবরু ভাষায় বহু পুস্তক লিখে গেছেন। ৭৬২-৬৩ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের জ্যোতিষী আল-নৌবখত এঁর সাথে মাশাল্লাহ বাগদাদ

নগরীর ভিত্তি স্থাপনে সহযোগিতা করেন। মধ্যযুগে তাঁর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় যে পুস্তক ছিলো তা হলো ‘ডি সাইনটিয়া মোটাস অরবিস’ যা গেরারডো ক্রেমোনিসি নামে একব্যক্তি মূল আরবি ‘সপ্ত-বিংশ’ থেকে লেটিনে ভাষান্তরিত করেন। লেটিন সংস্করণ ১৫০১ ইংরেজিতে জার্মানির নিউরেমবোর্গ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ ‘ডি ইলেমেনটিস এট অরবিবাস কয়েলিসটিবাস’ নামে ১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং এতে সর্বমোট ২৭টা আলাদা পরিচ্ছেদ ছিলো।

জাবির ইবনে হাইয়ান

এই প্রখ্যাত মুসলিম আল-কেমিষ্টের পূর্ণ নাম হলো, আবু মুসা জাবির ইবনে হাইয়ান (আল-তুসী, আল-তারতুসী, আল-হাররানী)। অনেকের মতে তিনি একজন সূফী দরবেশও ছিলেন। ৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে আরবের কুফা নামক স্থান তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিলো। আরব আল-কেমিষ্টদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত। মধ্যযুগে গেবের নামে যে আলকেমিষ্ট সুপরিচিত ছিলেন, এ ব্যক্তিই সেই গেবের।

আষ্ট্রল্যাব যন্ত্রের উপর তাঁর লেখা একখানা বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে জাবিরের খ্যাতি যে কারণে প্রসিদ্ধ তা হলো তাঁর লিখিত আলকেমির (রসায়ন শাস্ত্রের) বই-পুস্তক যেগুলো আরবিতে প্রকাশিত হয়েছিলো। রাজ্যের বই, ভারসাম্যের ছোট গ্রন্থ, কৃপার বই, সমাহরণের বই, প্রাচ্যের পারদের বই প্রভৃতি গ্রন্থাবলীর লেখক হচ্ছেন জাবির ইবনে হাইয়ান। তাঁর বই পুস্তক থেকে এটাই ধারণা করা যায় যে, রসায়ন শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী একজন গবেষক ছিলেন। ভূতাত্ত্বিক ধাতু সৃষ্টির থিওরী (তথাকথিত সালফার-পারদ থিওরী অব ধাতু), সাধারণ পদার্থের প্রস্তুত প্রণালী (যেমন লেড কারবনেট; আরসেনিক ও আনটিমনি ও তাদের সালফেইত থেকে) প্রভৃতি বিষয়বস্তু তাঁরই দ্বারা আবিস্কৃত হয়।

জাবির ধাতু বিশুদ্ধকরণ, কাপড় ও চামড়ায় রং করার পদ্ধতি, ওয়াটার-প্রুফ, কাপড়ে ভারনিসকরণ, কাচ তৈরীতে মেঙ্গানিস ডাইওক্সাইডের ব্যবহার, সোনার অক্ষরে লেখার জন্য লৌহ পাইরাইটস এর ব্যবহার, এসেটিক এ্যসিড বৃদ্ধির জন্য সিরকা পাতন পদ্ধতি (ডিসটিলেশন) প্রভৃতি মৌলিক রসায়নিক কার্যকলাপের জনক ছিলেন। নিঃসন্দেহে ইসলামী বিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানের ইতিহাসে জাবির ইবনে হাইয়ানের অবদান অত্যন্ত প্রভাবশালী ও বিরাট ছিলো। তাঁর লেখা আরবি

অনেক উৎসগুলোকে ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে তাঁর অবদানের পূর্ণ মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। এ পর্যন্ত জাবির সম্পর্কে আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি, তা থেকেই সহজে অনুধাবন করা যায় যে, তিনি মধ্যযুগের সর্বপ্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন।

(খ) আল-খোওয়ারিজমির যুগ

বলতে গেলে নবম শতাব্দি মূলত মুসলিম বিজ্ঞানের শতাব্দি বলা যায়। যদিও অন্যান্য শতাব্দিতে মুসলিম বিজ্ঞানের কার্যাবলী বন্ধ হয়ে যায়নি, তথাপি নবম শতাব্দির মতো ইসলামী বিজ্ঞানের এমন চরম উন্নতি আর কোনটাতে হয়নি। বাস্তবে সেকালের সত্যিকার ইসলামী সভ্যতার অদর্শের-প্রতীক ছিলেন এসব জ্ঞান-পিপাসু বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এঁদের কার্যাবলী উন্নতমানের ছিলো। এ শতাব্দির প্রথমার্ধের কথা বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞানের অগ্রদূতসকল, আল-কিন্দি, আল-মুসার পূত্ররা, আল-খোওয়ারিজমি, আল-ফারগানি প্রমুখ সকলেই মুসলিম বিজ্ঞানী ছিলেন। একমাত্র ইবনে মাসাওয়া খ্রিস্টান ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনিও আরবিতে লিখেছেন।

সপ্তম আব্বাসী খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩), হারুন-উর-রশিদ থেকেও বেশী বিজ্ঞানের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বাগদাদে একটি বৈজ্ঞানিক একাডেমী প্রতিষ্ঠিত করেন, গ্রীক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহিত ও ভাষান্তর করার ব্যবস্থা করেন এবং সব ধরনের পণ্ডিতকে সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান করেন। যার ফলে তাঁর শাসনামলে বিশাল বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী সাধিত হয়।

আল-মামুন (৭৮৬ - ৮৩৩ খ্রিঃ)

আব্দুল্লাহ আল-মামুন ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন ও ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে তারসাস নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। আব্বাসী খলিফাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা মহীয়ান খলিফা। তাঁর মাতা ও স্ত্রী পারস্যের নিবাসী ছিলেন। তিনি ইসলামের মুতাজিলা সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে শক্তহস্ত ব্যবহার করতেও দ্বিধা করেন নি।

কুরআান শরীফ সৃষ্ট- অসৃষ্ট নয়, এই মতবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। যাঁরা এর বিরোধিতা করতেন, যেমন ইমাম হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, এঁদেরকে তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। যদিও মুতাজিলা মতবাদ বিরোধীদেরে তিনি কঠোর হস্তে

দমন করেছিলেন, তথাপি তাঁর দরবারে সুশিক্ষিত ইহুদি-খ্রিস্টানরা আমন্ত্রিত হতেন। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনায় ইতিহাসেরই স্বার্থে তার কার্যাবলীর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু এটাও সুস্পষ্টভাবে সবাইকে জ্ঞাত করা প্রয়োজন যে, খলীফা আল-মামুনের 'মুতাজিলা' মতবাদের প্রতি বিশ্বাসকে এই লেখা দ্বারা সমর্থন কিংবা এর গুণগান বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়। বিজ্ঞানের প্রতি তার অবদানকে তুলে ধরাই এ প্রসঙ্গে মূখ্য।

আল-মামুন গ্রীক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতে বেশ কষ্ট স্বীকার করেন এবং এর জন্য বাইজান্টাইন সম্রাট লিওন দ্যা আরমেনিয়ানের নিকট একদল দূত পাঠান। সংগৃহীত গ্রীক পাণ্ডুলিপি আরবিতে ভাষান্তর করার জন্য তিনি নির্দেশ দেন। 'বাইতুল হিকমা' বা জ্ঞানের ঘর নামে একটি বৈজ্ঞানিক একাডেমীরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খলিফা আল-মামুন। এখানে একটা বড় পাঠাগার ও একটা মানমন্দিরও (মহাকাশ অবজারভেটরী) ছিলো। পালমিরা উপত্যকায় তিনি আরও একটি মানমন্দির তৈরি করেন। এ মানমন্দির ব্যবহারের মাধ্যমে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সৌরজগতের ক্রান্তিবৃত্তের মাত্রা নির্ণয় করতে সক্ষম হন। গ্রহগুলোর কক্ষপথ সম্পর্কে টেবিলও তৈরী করা হয় এ দু'টি মানমন্দির ব্যবহারের মাধ্যমে।

আল-মামুন পৃথিবীর সঠিক পরিধি আবিস্কারের জন্য বিজ্ঞানীদেরে নির্দেশ দেন, এবং এর ফলে পৃথিবীর পরিধি ২০,৪০০ মাইল বলে পাওয়া যায়। পৃথিবীর একটি বড় মানচিত্র তাঁর নির্দেশে অঙ্কিত করা হয়। আল-মামুন সর্বদাই দার্শনিক, ভাষাতত্ত্ববিৎ, ঐতিহ্যবিৎ, গাণিতিক, চিকিৎসক, জ্যোতিষবিৎ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদেরে উৎসাহ ও সাহায্য দান করতেন।

আল-কিন্দি

আবু ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে আল-সাব্বাহ আল-কিন্দি 'আরবদের দার্শনিক' নামে খ্যাত ছিলেন। খলিফা আল-মামুনের শাসনকালে বসরায় তাঁর জন্ম হয়। মুতাওয়াক্কালীর নেতৃত্বে নৈষ্ঠিক প্রতিক্রিয়ার সময় তাঁকে নির্যাতন করা হয়। এ দার্শনিক ৮৭৩ ইংরেজিতে মৃত্যুবরণ করেন।

আল-কিন্দি প্রথম এবং একমাত্র আরব জাতির প্রখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের উপর তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিলো। নিও-প্লেটোনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এ্যারিস্টটলকে অধ্যয়ন করেন। কথিত আছে এ জ্ঞান তাপস ২৭০ খানা বইয়ের লেখক ছিলেন, যদিও আজ এর অনেক কমসংখ্যক বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে মাত্র। তাঁর বইগুলোর বিষয়বস্তুর মধ্যে অঙ্ক শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান, সংগীত, ঔষধ, ফারমেসী এবং ভূগোল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি হিন্দুদের ব্যবহৃত সংখ্যার উপর চারটা বই লিখেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে অনেক গ্রীক পুস্তকাদি আরবিতে ভাষান্তরিত হয়। তাঁর লেখা দু'টি বই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়। এগুলোর লেটিন নাম হলোঃ "ডি এসপেকটিবাস" ও "ডি মেডিসিনেরাম কমপোজিটেরাম গ্রাডিবাস"। প্রথম বইটির বিষয়বস্তু হলো জ্যামিতি এবং শরীরবৃত্ত-সম্পর্কীয় আলোক বিজ্ঞান, যা সাধারণতঃ ইউক্লিড ও এ্যারিস্টটলের ধারণার উপর ভিত্তি করে লেখা। দ্বিতীয় বইটিতে তিনি দেহের ও মনের ভাবভঙ্গিকে গাণিতিক উপায়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন।

আল-কিন্দি মুসলমান লেখকদের মধ্যে সর্বপ্রথম লেখক যিনি সঙ্গীতের উপর লেখালেখি করেন, যা আজো মানুষ ব্যবহার করে থাকে। সঙ্গীতে পিচ বা সুর বাঁধার স্বরলিপির জনক হচ্ছেন আল-কিন্দি। তাঁর লেখালেখি গেরারডো ডা ক্রেমোনা নামক একব্যক্তি লেটিনে ভাষান্তর করেন। বিশিষ্ট দার্শনিক কারডানোর মতে আল-কিন্দি ছিলেন তখনকার মধ্যযুগ ও প্রাচীনকালের ১২ জন জ্ঞান তাপসের মধ্যে একজন।

ইসলামী গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান

এ সময়ে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতিসাধন হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্য টেবিল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে গণিতের ট্রিগোনোমেট্রি শাখার প্রসার ঘটে। ভৌগোলিক আল-হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইউক্লিডের প্রখ্যাত গ্রন্থ ইলেমেন্ট আরবিতে ভাষান্তর করেন, এবং আল-আব্বাস এ গ্রন্থের উপর আলোচনা করেন। একই সময় আবু সাঈদ আদ-দারীর জ্যামিতির উপর বই রচনা করেন।

আল-হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ

বাগদাদে ৭৮৬ থেকে ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ বিজ্ঞানী কর্মরত ছিলেন। তিনিই ইউক্লিডের ইলেমেন্ট গ্রন্থকে প্রথমে আরবিতে তরজমা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞানের পুস্তক আলমাজেষ্ট বইটিও আরবিতে ভাষান্তরিত হয়। বাস্তবে তিনি দু'বার এ বইটি তরজমা করেন। খলিফা হারুন-উর-রশিদের সময় একবার ও খলিফা আল-মামুনের সময় আরেকবার।

আল-আব্বাস ইবনে সাঈদ

মুসলিম গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ইবনে সাঈদ খলিফা আল-মামুনের সময় বাগদাদে কর্মরত ছিলেন। ৮২৯-৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে অনুষ্ঠিত মহাকাশ পর্যবেক্ষণে তিনি সক্রিয় অঙ্কগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে দামেস্কতে অনুষ্ঠিত পর্যবেক্ষণেও যোগ দেন। ইবনে সাঈদ ইউক্লিডের ইলেমেন্টের উপর মূল্যবান আলোচনা-সমালোচনা করেন।

আবু সাঈদ আদ-দারীর

আবু সাঈদ আদ-দারীর নবন শতাব্দির প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। ৮৪৫ থেকে ৮৪৬ এর কোনও সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনিও একজন মুসলমান গাণিতিক এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর অবদানের মধ্যে জ্যামিতির উপর লেখা একখানা পুস্তক ও পৃথিবীর মধ্যরেখা বা মেরিডিয়ানের উপর লেখা আরেকখানা বই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আল-খোওয়ারিজমী

এই প্রখ্যাত গণিতবিদের পূর্ণ নাম ছিলো, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খোওয়ারিজমী (খোয়ারিজমী ও খারিজমীও বলা হয়ে থাকে)। এ্যারেল সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত খোওয়ারিজম্ (বর্তমানে উজবেকিস্তানের খিবা) নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। তবে খোওয়ারিজমী নামেই তিনি সুপ্রসিদ্ধ। বস্তুত

খোওয়ারিজমী নামের বিকৃত রূপই হচ্ছে আজকের অঙ্ক শাস্ত্রে (কম্পিউটার বিজ্ঞানে) ব্যবহৃত শব্দ আলগরিথিম।

খলিফা আল-মামুনের সময়ে আল-খোওয়ারিজমী কর্মরত ছিলেন এবং ৮৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। আল-খোওয়ারিজমী তাঁর সময়ের সর্বাপেক্ষা প্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন। মধ্যযুগে অঙ্ক শাস্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার তাঁর মতো আর কেউই করতে পারেননি। পাঠীগণিত ও বীজগণিতের উপর তাঁর লেখা বই পুস্তক মূল আরবি ভাষার কপিগুলো আজো পাওয়া যায়নি, কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দিতে লেটিনে ভাষান্তরিত সংস্করণ এখনো আছে। আল-খোওয়ারিজমী এই পুস্তকগুলোর মাধ্যমে মুসলিম আরব-অনারব ও ইউরোপীয়দেরকে ভারতে আবিষ্কৃত সংখ্যা পদ্ধতি জানিয়ে দেন যা আজো পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।

তিনি এ্যালজেবরা বা বীজগণিতেরও জনক ছিলেন। শূন্যসহ ১০টি সংখ্যা ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি বীজগণিতের বহু সমীকরণের সমাধান করে গিয়েছেন। তাঁর দ্বারা সৃষ্ট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল টেবিল ১১২৬ খ্রিস্টাব্দে আবেলার্ড অব বাথ নামক একজন ইংরেজ লেটিনে তরজমা করেন। এসব টেবিলে শুধু সাইন ফাংশনই ছিলো না, এতে টানজেন্ট ফাংশনও ছিলো। আল-খোওয়ারিজমী টলেমির জ্যামিতিকেও সংস্কার করেন।

সহল আল-তাবারি

তাঁর অন্য নাম হলো রাব্বান আল-তাবারি, যার অর্থ হচ্ছে- তাবারিস্তানের রাবি। নবম শতকের শুরুতে এ ইহুদি বিজ্ঞানী জীবিত ছিলেন এবং তিনিই টলেমির আলমাজেষ্ট গ্রন্থটিকে প্রথমে আরবি ভাষায় তরজমা করেন।

হামিদ আল-নাহাওয়ান্দি

এই মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পূর্ণ নাম হলো, হামিদ ইবনে মুহাম্মদ আল-নাহাওয়ান্দি এবং জুন্দিশপুর নামক স্থানে ৮০০ খ্রিস্টাব্দে কর্মরত ছিলেন। তিনি

জুন্দিশপুরে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করেন ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর 'মুসতামিল' নামে একটি বিশেষ ডাটা (তথ্য) টেবিল তৈরী করেন।

হাবাশ আল-হাসিব

হামিদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-মারওয়াজি হাবাশ আল-হাসিব, বাগদাদে কর্মরত ছিলেন এবং ৮৬৪-৮৭৪ এর কোন এক সময়ে ইন্তেকাল করেন। আল-হাসিব শব্দের অর্থ হচ্ছে হিসাবী বা হিসাবকারক। এতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে এ ব্যক্তি একজন গাণিতজ্ঞ ছিলেন। আল-মামুন ও আল-মুনতাসিমের দরবারে তিনি কাজ করেন। হিন্দুদের পদ্ধতি অবলম্বন করে একটি টেবিলসহ তিনি মোট তিনটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের টেবিল তৈরী করেন।

ইসলামী চিকিৎসা বিদ্যা বা ঔষধবিজ্ঞান

চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান অতুলনীয়। নিম্নে এ শাস্ত্রের সাথে জড়িত বহু বিজ্ঞানীদের মধ্যে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা হলো।

ইবনে শাহদা

বাগদাদের নিকটে আল-খার্ক নামক স্থানে এ বিজ্ঞানী নবম শতাব্দির প্রথমার্ধে কর্মরত ছিলেন। বহু গ্রীক লেখা তিনি আরবি ও সিরিয়াক ভাষায় তরজমা করেন। গ্রীক হিপোক্রিটাসের লেখা তিনি আরবিতে ভাষান্তর করেন এবং গ্যালেনের লেখালেখি সিরিয়াক ভাষায় তরজমা করেন।

জিব্রিল ইবনে বাখতিসু

এ প্রখ্যাত ডাক্তার খলিফা হারুন-উর-রশিদ ও আল-মামুনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন। ৮২৮-৮২৯ খ্রিস্টাব্দের কোনও এক সময়ে এ বিজ্ঞানী মৃত্যুবরণ করেন। জিব্রিল ইবনে বাখতিসু খ্রিস্টান ছিলেন। তিনি ডাক্তারীর উপর একাদিক পুস্তক রচনা করেন এবং তাঁর ধারণা পরবর্তীতে বেশ প্রভাব সৃষ্টি করে

এ বিষয়ের উপর। জিব্রিল ইবনে বাখতিসু, বাগদাদের প্রখ্যাত বাখতিসু পরিবারের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং বেশ কষ্ট স্বীকার করে তিনি গ্রীকদের চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর লিখিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন।

সালমাওয়াই ইবনে বুয়ান

নেষ্টরিয়ান একজন খ্রিস্টান ডাক্তার ছিলেন ইবনে বুয়ান, যিনি আল-মামুন ও আল-মুনতাসিমের শাসনামলে বাগদাদে জীবিত ছিলেন। ৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি হুনাইনকে গ্যালেনের 'মেথডাস মেডেন্ডি' ভাষান্তর করতে সাহায্য করেন ও পরে হুনাইনের কার্যাবলীর উপর উৎসাহ দান করেন।

ইবনে বুয়ান, ইবনে মাসাওয়াই এর সাথে বৈজ্ঞানিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলেন।

ইবনে মাসাওয়াই

লেটিন ভাষায় তিনি মিসু মেজর নামে সুপরিচিত। তবে তাঁর প্রকৃত নাম হলো- আবু জাকারিয়া ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াই। তিনি জুনদিশপুর নিবাসী একজন ঔষধবিক্রেতার পূত্র ছিলেন। বাগদাদে গমন করে মাসাওয়াই, বকতিয়াসুর নিকট পড়াশুনা করেন। ৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সামারা নামক স্থানে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনিও একজন খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ডাক্তার ছিলেন এবং আরবি ও সিরিয়াক ভাষায় লেখালেখি করেন। তিনি ইবনে ইসহাকের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বহু গ্রীক বই-পুস্তক আরবি ও সিরিয়াক ভাষায় তরজমা করা হয়। খলিফা আল-মুনতাসিম তাঁকে বানর সংগ্রহ করে দিতেন, কেটে মেডিক্যাল পরীক্ষা করার জন্য। এ্যানাটমি ও মেডিক্যাল বিষয়ে এ ডাক্তার বহু লেখালেখি করেছেন। এসব লেখা মধ্যযুগে চিকিৎসকদের ব্যবহারের জন্য খুব বেশী প্রয়োজনীয় ছিলো।

(গ) আর-রাজির যুগ

আব্বাসী খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরে মুক্তমনে পূর্ণ নিরাপত্তায় কাজ করতে উৎসাহিত করতে থাকেন তাঁর পূর্বসুরিদের মতো। কুরআন শরীফ গবেষণার জন্যও দাউদ আয-যাহিরী একটি নতুন ধার্মিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেন। কুরআন শরীফের আক্ষরিক ব্যাখ্যার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এ প্রতিষ্ঠান কাজ করে। তবে এ প্রচেষ্টা স্থায়ী ছিলো না।

ইমাম বুখারী (রঃ) প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুসলিম চিন্তাবিদরা নতুন নতুন বই প্রকাশ করেন ইসলামী মৌলিক বিষয়বস্তুর উপর, যার ভিত্তি ছিলো থিওরিটিক্যাল। একই সময় মিশরের প্রখ্যাত দরবেশ ঝুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সুফিতত্ত্বের উপর গুরুত্বপূর্ণ লেখালেখি প্রকাশ করেন।

আল-মাহানি

পারস্য দেশের কিরমানের মাহান নামক স্থানে আবু আব্দুল্লাহ আল-মাহানির জন্ম হয়। তিনি ৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কর্মরত ছিলেন এবং ৮৭৪-৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময়ে মারা যান। তিনি একজন গাণিতিক ছিলেন, মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের উপর লেখালেখি করেন। তিনি ইউক্লিড ও আর্কিমিডিসের উপর আলোচনা-সমালোচনা করেন এবং ইসহাক ইবনে হুনাইনের দ্বারা ভাষান্তরিত বই-পুস্তকের সংস্কার করেন।

হামিদ ইবনে ইউসুফ আল-মিশরী

মিশরের আবু জাফর হামিদ ইবনে ইউসুফ ইবনে ইব্রাহিম আদ-দায়া আল-মিশরী হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দিতে মিশরে কর্মরত ছিলেন। খ্রিস্টীয় ৯১২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। মিশরে তুলুনী শাসকদের জন্য তিনি কাজ করেন। তাঁর লেখালেখির মধ্যে টলেমির সেন্টিলোকুইয়াম ও প্রপরশন এর উপর একটি বই উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত বইটি পরবর্তীতে ইউরোপীয় গণিতে বেশ প্রভাব সৃষ্টি করে।

আন-নাইরিজি

পারস্যের সিরাজ নামক স্থানে এ গাণিতিকের জন্ম হয়। তাঁর পূর্ণ নাম হলো, আবু-ই-আব্বাস আল-ফজল ইবনে হাতিম আন-নাইরিজি। বাগদাদের খলিফা আল-মুক্তাদিরের সময় তিনি কর্মরত ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর বেশ কিছু কাজ তিনি করে গেছেন এবং মুক্তাদিরের জন্য বায়ুমণ্ডলের উপর একখানা বইও লিখেন। ইউক্লিড ও টলেমির উপর তিনি অভিমত লিখেন। অ্যাস্ট্রলেবের উপর একখানা গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের লেখক হলেন আন-নাইরিজি, যেটি অনেকের মতে এ বিষয়ের উপর আরাবী ভাষায় প্রকাশিত প্রধান বই।

তাবিত ইবনে কুররা

ইরাকের হারান নামক স্থানে আবু হাসান তাবিত ইবনে কুররা মারওয়ান আল-হারানি এর জন্ম হয় ৮২৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি বাগদাদে কাজ করেন এবং ৯০১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ইবনে কুররা ডাক্তার, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গাণিতিক ছিলেন এবং গ্রীক ও সিরিয়াক থেকে তিনি বহু মূল্যবান বই আরবি ভাষায় তরজমা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বাগদাদে ভাষান্তর করার একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যেখানে তাঁর নিজস্ব পরিবারের অনেকেই কর্মরত ছিলেন। তিনি সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করে গবেষণামূলক লেখা প্রকাশ করেন।

ইউসুফ আল-খুরী

খলিফা আল-মুকতাফিরের সময়ে এই ডাক্তার ও গাণিতিক জীবিত ছিলেন। তিনিও অন্যান্যদের মতো একজন অনুবাদক ছিলেন। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তিনি সিরিয়াক থেকে আরবিতে অনুবাদ করেন। তিনি আরকিমিডিস ও গ্যালেনের বই-পুস্তক ভাষান্তর করেন।

হামিদ ইবনে আলী

আবু-ই-রাবি হামিদ ইবনে আলী আল-ওয়াসিতি হলো এই ইরাকের জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পূর্ণ নাম। নবম শতাব্দির শেষের দিকে তিনি কর্মরত ছিলেন। ইবনে ইউনুসের মতে আলী ইবনে ঈসা ও হামিদ আষ্ট্রলেবের প্রাথমিক নির্মাতা ছিলেন। এবং তাঁদেরে তিনি টলেমী ও গ্যালেনের সাথে তুলনা করে দেখেছেন। এতে এটা সহজেই বুঝা যায় যে, তখনকার মুসলমানরা ভাল যন্ত্রপাতির উপর কতটুকু গুরুত্ত্ব দিতেন।

সবুর ইবনে সহল

এই খ্রিস্টান চিকিৎসক জুনদিশপুরে কাজ করেন ও ৮৬০ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। মেডিক্যাল বিজ্ঞানের উপর ২২ খণ্ডে সমাপ্ত এক বিরাট গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন এই বিজ্ঞানী। ইবনে আল-তিলমিজের নতুন বই প্রকাশিত হবার পূর্ব পর্যন্ত মেডিসিনের জন্য এ বইটি আদর্শ হিসাবে ব্যবহৃত হতো।

ইয়াহইয়া ইবনে সারাফিন

দামেস্ক শহরে নবম শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে এই খ্রিস্টান চিকিৎসক কর্মরত ছিলেন। দু'টি মেডিক্যাল পুস্তকের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ, এগুলোর মধ্যে একটির নাম ছিলো কুন্নাস আর অপরটির নাম পানডেকটস। শেষোক্ত বইটি মূল সিরিয়াক থেকে আরবিতে তরজমা করা হয় এবং পরবর্তীতে এর গুরুত্ত্ব বিবেচনা করে লেটিনে ভাষান্তর করা হয়। এ বইটি মধ্যযুগে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যার মধ্যে রোগের ঔষধের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিলো।

আর-রাজি

লেটিনে তাঁকে রাঝিজ বলা হয়, কিন্তু মধ্যযুগে চিকিৎসা শাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা প্রধান এই ব্যাক্তিত্বের পূর্ণ নাম হলো, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আর-রাজি। বর্তমান ইরানের তেহরানের নিকটে রায় নামক স্থানে নবম শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রায় ও বাগদাদে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। ৯২৩ বা ৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। রসায়ন শাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিলো- বলতে গেলে এ শাস্ত্রের জনক ছিলেন এ প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন, এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ক'টি হলো- "কিতাব আল-হাউই", "কিতাব আল-মানসুরী" ও "কিতাব আল-জাদারি ওয়াল হাসবা"। কিতাব আল-হাউই ছিলো এক বিরাট আকারের জ্ঞানপঞ্জী যেখানে গ্রীক ও হিন্দুদের জ্ঞানের অনেককিছু সংগ্রহিত করা হয়, বইটিতে রাজির নিজস্ব বৈজ্ঞানিক চিন্তাদ্বারাও প্রকাশ পায়। কিতাব আল-মানসুরীর মধ্যে বিশেষ করে গ্রীক বিজ্ঞানের প্রতি গুরুত্ত্ব আরোপ করা হয়। এ বইটি ১০ খণ্ডে সমাপ্ত করা হয়েছিলো। কিতাব আল-জাদারি ওয়াল হাসবা বইয়ে আর-রাজি বসন্ত ও হাম রোগের কারণ এবং চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই বইটিকে "মুসলিম মেডিসিনের সর্বাপেক্ষা পুরাতন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ধাত্রীবিদ্যা, গাইনিকোলজি, চক্ষু চিকিৎসা প্রভৃতি মেডিসিনের বহু শাখার জনক ছিলেন, আর-রাজি। রসায়ন শাস্ত্রের উপর অনেক বই তিনি লিখেছিলেন বলে জানা যায়। এর মধ্যে রসায়নিক পরিমাপ ও পরীক্ষার যন্ত্রপাতির একটা তালিকা আছে যেখানে মোট ২৫টি ভিন্ন যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে।

হুনাইন ইবনে ইসহাক

তাঁর পূর্ণ নাম হলো আবু জায়েদ হুনাইন ইবনে ইসহাক আল-ইবাদি। ৮০৯ থেকে ৮১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর জন্ম হয়েছিলো বলে ধারণা করা হয়েছে। প্রথমে জুনদিশপুর ও পরে বাগদাদে তিনি কাজ করেন। ৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদেই তাঁর মৃত্যু হয়।

হুনাইন ইবনে ইসহাক একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ইবনে মাসাওয়ার নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন, এবং বনী মুসা নামক আরব বংশদ্ভুত একব্যক্তি গ্রীক লেখাকে আরবিতে তরজমা করার জন্য তাঁকে দায়িত্ব দেয়। মেডিক্যাল বইয়ের অনুবাদের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেন। তাঁর অনুবাদের মধ্যে হিপোক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিষ্টটল, ডাইওসকরাটিস এবং টলেমি প্রমুখ গ্রীক বিজ্ঞানীদের বই-পুস্তক অন্তর্গত ছিলো। হুনাইনের এসব অনুবাদের গুরুত্ত্ব এতো বেশী ছিলো যে, এসব কার্যের ফলেই মুসলিম জ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো যা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়।

কুস্তা ইবনে লুকা আল-বালাবাক্কি

সিরিয়া দেশের বালাবেক বা হিলিওপলিস নামক স্থানে এই গ্রীক বংশোদ্ভূত খ্রিস্টান দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর জন্ম হয়। ৯১২ খ্রিস্টাব্দে রমেনিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। সিরিয়াক ভাষায় গ্রীক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের বহু পুস্তক তিনি অনুবাদ করেন, এঁদের মধ্যে ডাইওফানটস, থিওডসিওস, অটোলাইকস, হিপসাইকলস, রিষ্টারকস এবং হিরন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইউক্লিডের উপর অভিমত ও বৃত্তাকার আষ্ট্রলেবের উপর বই প্রকাশ করেন।

জাবির ইবনে সিনান

জাবির ইবনে সিনান আল-হারানি নামক এই বিজ্ঞানী সম্পর্কে বেশ কিছু জানা যায়নি। তবে এ ব্যক্তি জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির প্রস্তুতকারক ছিলেন। এবং তিনিই হয়ত সর্বপ্রথম বৃত্তাকারের আষ্ট্রলেব তৈরী করেছিলেন।

আল-বাতানি

এই প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর পূর্ণ নাম বেশ লম্বা- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে জাবির ইবনে সিনান আল-বাতানি আল-হারানি আস-সাবি। ৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে হারান নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। ফোরাতের নিকটবর্তী আল-রাক্কা নামক জায়গায় তিনি কাজ

করেন এবং ৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সামারায় মারা যান। তাঁর সময়ের সর্বাপেক্ষা প্রধান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ইসলামের একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন আল-বাতানি। তিনি বিজ্ঞানের উপর বহু লেখালেখি করেন তবে তাঁর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান যে গ্রন্থ ছিলো, সেটির লেটিন নাম হলো "ডি সাইনটিয়া"। এতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অসংখ্য তথ্যাবলী সংগ্রহিত করা হয়েছিলো। এ বইটি রেঁনেসার পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেছেন। ৮৭৭ এর পর থেকে তিনি মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করেন অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে। ৮৮০-৮৮১, এই বছরে তারকাদের অবস্থানের একটি টেবিল তিনি তৈরী করেন।

আবু বকর

লেটিনে তাঁর নামকে "আলবুবাতার"-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে, তবে তাঁর আসল নাম হলো, আবু বকর আল-হাসান ইবনে আল-খাসিব। এই মুসলিম বিজ্ঞানী পারস্য দেশের অধিবাসী ছিলেন এবং আরবি ও ফার্সী ভাষায় লেখালেখি করেন। মধ্যযুগে তাঁর লেখা একটি বই যার লেটিন নাম হলো, "ডি নেটিভিটাটিবাস", অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বইটির বিষয়বস্তু ছিলো জ্যোতিষ শাস্ত্র।

(ঘ) আল-মাসুদের সময়

সমগ্র দশম শতাব্দি ধরে মুসলমানদের বিজ্ঞান চর্চা চলতে থাকে পূর্বের মতোই। বস্তুত এ সময়ে বিজ্ঞান চেতনা মুসলমানদের মধ্যে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু শুধুমাত্র বিশিষ্ট একটি বিজ্ঞানমহলে সীমাবদ্ধ ছিলো না; সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিজ্ঞানের চেতনা একটি স্বাভাবিক মুসলিম ঐতিহ্যে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো। এ সময় পাশ্চাত্য জগতেও একটা ধারণা জন্মে যে, মুসলমানদের নিকট বিজ্ঞানের সবকিছু জমা আছে, সুতরাং তাদের নিকট থেকে পশ্চিমা দেশসমূহকে বিজ্ঞান-শিক্ষা করতে হবে। তাছাড়া নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও নতুন ধারণা এখন থেকে শুধুমাত্র আরবি ভাষায় প্রকাশ করা হয়। সুতরাং বিজ্ঞান শিখতে হলে আরবি ভাষা শিখে একমাত্র আরবদের নিকটই শিখতে হবে; এমন একটা ধারণা সমগ্র পশ্চিমে জাগ্রত হয়ে ওঠে দশম শতাব্দির শুরু থেকেই।

বিজ্ঞানের ভাষা তখন কুরআনের ভাষা- আরবি ছিলো। আর বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন মুসলমান। পশ্চিমে মুসলিম স্পেনে উমাইয়্যা খলিফা আব্দুর রাহমান-২য় বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য সচেষ্ট হন। যার ফলে বিজ্ঞানের চেতনা পশ্চিমে বিস্তার লাভ করতে সহায়তা করে। তবে তখনও ইসলামী বিজ্ঞানের অগ্রগতি মূলত প্রচ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো।

ইবনে আল-আদমী

এই জ্যোতির্বিজ্ঞানী দশম শতাব্দির শুরুতে বিজ্ঞানচর্চা করেন। তিনি মহাকাশে তারকাদের অবস্থান, দূরত্ব ও ঔজ্জ্বল্যতা সম্বলিত ডাটা টেবিল তৈরী করতে শুরু করেন যা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই ছাত্র হিসাম আল-মাদানি সম্পূর্ণ করেন। এ টেবিল ৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় ‘নুজুম আল-ইক্বদ’ নামে।

ইবনে মাজুর

তাঁর পূর্ণ নাম হলো, আবুল কাশিম আব্দুল্লাহ ইবনে মাজুর আল-তারিক। তাঁর জন্মস্থান ছিলো তুর্কীর ফারগানা নামক জায়গায় এবং ৮৮৫-৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞান চর্চায় জড়িত ছিলেন।

মুসলমান মহাকাশ পর্যবেক্ষকদের মধ্যে ইবনে মাজুর প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি, তাঁর পুত্র ও একজন ক্রীতদাস (নাম; মুফলিহ) মিলে বিজ্ঞানের গবেষণা করতেন। তাঁর লেখা বই-পুস্তক ইবনে ইউনুস নামে আরেকজন বিজ্ঞানী সংগ্রহ করেছিলেন।

আবু কামিল

এই বিজ্ঞানীর পূর্ণ নাম পড়তে অনেক সময় লাগবে! আবু কামিল সুজা ইবনে আসলাম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুজা আল-হাসিব আল-মিসরী, এই হলো তাঁর পূর্ণ নাম। তাঁর নামের শেষোক্ত অর্থ হলো “মিশরীয় হিসাবকারক”। আল-খোওয়ারিজমীর পরে তিনি কর্মরত ছিলে, এবং ৮৫০ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। এ গাণিতিক আল-খোওয়ারিজমীর বীজগণিতের সংস্কার করেন।

এ্যালজেবরার ক্ষেত্রে গুণ ও ভাগ অঙ্ক করার পদ্ধতি তিনি দেখিয়ে দেন। তাঁর এসব গাণিতিক উপায় ও থিওরী পরবর্তীতে আল-কাকী ও লেনারডো ডি পিসা নামক প্রমুখ বিজ্ঞানী ব্যবহার করেন।

আবু উসমান

এই গণিতজ্ঞের পূর্ণ নাম হলো, আবু উসমান সাঈদ ইবনে ইয়াকুব আল-দামেস্কি। তাঁর জন্ম সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কতে। খলিফা আল-মুকতাদিরের সময় বাগদাদে তিনি কর্মরত ছিলেন। এ্যারিষ্টটল, ইউক্লিড ও গ্যালেনের বই-পুস্তক তিনি তরজমা করেন।

গ্যালেনের যে দু'টি বই তিনি অনুবাদ করেন এগুলো ছিলো, মানুষের মেজাজের উপর লেখা একটি আর অপরটি নাড়ির স্পন্দনের উপর লেখা। এতে বুঝা যায় যে, মেডিক্যাল বিজ্ঞানেও আল-উসমানের বিশেষ জ্ঞান ছিলো যার ফলে বাগদান, মক্কা মুয়াজ্জমা ও মদীনা শরীফের হাসপাতালগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিলো।

আল-বলখী

এই গাণিতিক ও ভৌগোলিকের জন্ম হয়, বলখের সালিস্থান নামক স্থানে। তাঁর পূর্ণ নাম হলো, আবু জায়েদ হামিদ ইবনে সাহল আল-বলখী, এবং ৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

তিনি আল-কিন্দির শিষ্য ছিলেন। এই বিজ্ঞানী বহু পুস্তকের রচয়িতা ছিলেন। তাঁর লেখা ভৌগোলিক ম্যাপের বইগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইব্রাহিম ইবনে সিনান

তিনি ছিলেন তাবিত ইবনে-কুররার নাতি। এই বিজ্ঞানীর পূর্ণ নাম হলো, আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে সিনান ইবনে তাবিত ইবনে কুররা। তাঁর পিতার নাম সিনান, তিনিও একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। ইব্রাহিম ইবনে সিনান জ্যামিতি শাস্ত্রের "কনিক সেকশন" ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর লিখিত "আলমাজেষ্ট" এর উপর অভিমত ও সমালোচনা করেন।

তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যামিতির উপরও বহু গবেষণামূলক বই লিখেন। গণিতের "কোয়াড্রেচার অব দ্যা পারাবলা" এর সমাধান তিনি উপস্থাপন করেছিলেন যা ছিলো আরকিমিডিসের সমাধানের তুলনায় অনেক সহজ। বস্তুত এ গুরুত্বপূর্ণ সমাধানটি গণিতের উচ্চতর শাখা কালকুলাস আবিষ্কৃত হবার পূর্ব পর্যন্ত তা গ্রহণযোগ্য ছিলো।

আল-ইমরানী

আলী ইবনে হামিদ আল-ইমরানীর জন্ম হয় ইরাকের মসুল নামক স্থানে। ৯৫৫-৯৫৬ তে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন বলে জানা যায়।
আবু কামিলের লেখা বীজগণিতের উপর তিনি মতামত প্রকাশ করেন এবং আরও অনেক বই লিখেন। তাঁর একটি জ্যোতিষ শাস্ত্রের বই- 'ভাল দিন সাব্যস্ত করার পদ্ধতি', সাবাসোরডা নমক একজন স্পেনিস, ১১৩১ খ্রিস্টাব্দে বারসিলনায় অনুবাদ করেছিলেন যা পরবর্তীতে ইউরোপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ইবনে ওয়াসিয়া

এই গবেষকের পূর্ণ নাম হলো আবু বকর হামিদ ইবনে আলী ইবনে আল-ওয়াসিয়া আল-কালদানি। তাঁর জন্ম হয় ইরাকে ৯১২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে। তাঁর গবেষণা ছিলো আলকেমী ও অজ্ঞাত (প্রত্যক্ষিত আশ্চর্য ঘটনাবলী) বিষয়বস্তুর উপর। ৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর লেখা এ বই, "কিতাব আল-ফালাহাল নাবাতিয়া" নামে প্রকাশিত হয়। এ বইটিতে তিনি প্রাক-ইসলামী সভ্যতার উপর আলোচনা করেন। এছাড়া এ পুস্তকে কৃষিব্যবস্থা ও অন্ধবিশ্বাসের উপর মূল্যবান তত্ত্ব সম্বলিত করা হয়।

ইসহাক আল-ইসরাঈলী

এই ইহুদি বিজ্ঞানীর পূর্ণ নাম হলো, আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে সুলাইমান। তাঁর জন্ম হয় মিশরে এবং টুনিসিয়ার কুয়াইরাওয়ান নামক স্থানে কর্মজীবন অতিবাহিত করে সেখানেই ৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। এ বিজ্ঞানী পেশাগত দিক দিয়ে দার্শনিক ও ডাক্তার ছিলেন। ইহুদিদেরে গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রতি দৃষ্টি দেবার জন্য তিনিই প্রথমে সচেষ্ট হন।

আল-ইসরাঈলী, উমাইয়্যা খলিফা, উবাইদুল্লাহ আল-মাহদী-এঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসাবে কাজ করেন। খলিফার নির্দেশে তিনি একাধিক বই লিখেন মেডিক্যাল বিজ্ঞানের উপর। তাঁর লেখা প্রধান প্রধান বইগুলো হলোঃ "কিতাব আল-হুম্মায়াত"- জ্বরের উপর লেখা, "কিতাব আল-বাউল"- প্রস্রাব বা ইউরিন্যাল সিষ্টেমের উপর লেখা এবং "কিতাব আল-ইসতিকসাত"- পদার্থের উপর লেখা।

আল-ইসরাঈলী ছিলেন প্রথম ইহুদি দার্শনিক যিনি বিজ্ঞানকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করে অধ্যয়ন করার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য এ পদ্ধতি মূলত এ্যারিষ্টটেলিয়ান ছিলো, যা মুসলমানদের দ্বারা সংস্কার করা হয়।

(ঙ) আবু-ই-ওয়াফার যুগ

দশম শতাব্দির এ দ্বিতীয়ার্ধের যুগে পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় বিজ্ঞানের চেতনা ছিলো আরও উন্নততর ও সুদূরপ্রসারী। এ সময়ের পূর্বেই খোওয়ারিজমি "বিজ্ঞানের চাবিকাঠি" বইটি প্রকাশ করে বৈজ্ঞানিক উন্নতির পথকে প্রশস্ত করে দেন। এখন বিজ্ঞানের উপর গবেষণা বলতে যা বুঝায় তা একমাত্র মুসলমানদের হাতেই হচ্ছিল। অঙ্ক শাস্ত্রে মুসলমানরা তখন একচ্ছত্রভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন। এটা বেশ প্রয়োজনীয়ও ছিলো, কারণ অঙ্কই হচ্ছে যাবতীয় বিজ্ঞানের "জননী"।

অঙ্ক ছাড়া বিজ্ঞান সম্পূর্ণ অচল হয়ে যাবে। মুসলমানরা অঙ্ক শাস্ত্রের গুরুত্ব ভাল করে জানতেন, তাই আমরা দেখতে পাই যে, এ শাস্ত্রের উন্নয়নে তাঁরা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্ব করে অগ্রসর হয়েছেন। গণিতকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করে তাঁরা গবেষণা করেছেন। তিন ধরনের গাণিতিকরা আলাদাভাবে এ শাস্ত্রের উপর ষ্ট্যাডি করেনঃ পাটীগণিত বিশেষজ্ঞ, বীজগণিত বিশেষজ্ঞ ও জ্যামিতি বিশেষজ্ঞ।

মুতাহহার ইবনে তাহির

মক্কা নগরীতে মুতাহহার ইবনে তাহির আল-মুকাদ্দিসির জন্ম হয়। সিজিস্থানের বাস্‌ত নামক স্থানে তিনি কর্মরত ছিলেন। তিনি বিশ্বকোষ লেখক ছিলেন, "কিতাব আল-বাদওয়াত তারিখ" অর্থাৎ সৃষ্টি ও ইতিহাসের পুস্তক, বইটি তাঁরই লেখা। এ বইটিতে লেখক সমসাময়িক পৃথিবীর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হিন্দুদের দ্বারা প্রকাশিত একটি নাম্বারঃ ৪৩২,০০,০০,০০০ নিয়ে তিনি গবেষণা করেন, যা ছিলো পৃথিবীর বয়েসের একটি হিসাব।

আবু জাফর আল-খাজিম

এই ব্যক্তির নামের (আল-খাজিম) অর্থ হলো, কোষাধ্যক্ষ। তাঁর জন্ম হয় ইরানের খোরাসামে এবং ৯৬১ থেকে ৯৭১ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময়ে মৃত্যু হয়।

পেশাগত দিক দিয়ে তিনি গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। আল-খাজিম ইউক্লিডের দশম পুস্তকের উপর অভিমত প্রকাশ করেন এবং গণিতের উপর আরও বহু বই-পুস্তক লিখেন। তিনি গাণিতিক বহু সমীকরণেরও সমাধান করেন।

নাফিজ ইবনে ইয়েমনী

এই বিজ্ঞানী একজন খ্রিস্টান পাদ্রী ছিলেন তবে তিনি বুয়াহি সুলতান আদ-দৌলার জন্য কাজ করেন। ৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ইবনে ইয়েমনের মৃত্যু হয়। তিনি একজন অনুবাদক হিসেবে কাজ করেন এবং ইউক্লিডের ইলেমেন্টের দশম বই তিনি আরবিতে ভাষান্তর করেন।

আবুল ফাতহা

ইসফাহানে ৯৮২ খ্রিস্টাব্দের দিকে আবুল ফাতহা মাহমুদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ইবনে ফাজল আল-ইসফাহানি কর্মরত ছিলেন। পারস্য মুসলিম এই গাণিতিক অঙ্ক শাস্ত্রের উপর বহু গবেষণা করেন। "কনিক্স" নামে গণিতের শাখায় তাঁর অবদান ছিলো উল্লেখযোগ্য।

আল-কুহী

এই বিজ্ঞানীর পূর্ণ নাম হলো, আবু সহল উইজান ইবনে রুস্তুম আল-কুহী। তাঁর জন্ম হয় তাবারিস্তানে এবং ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে কাজ করেন বলে জানা যায়। একজন গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি বহু বই-পুস্তক লিখেন। সুলতান শরাফ উদ-দৌলা একটি মানমন্দির তৈরী করেছিলেন। তিনি এ মানমন্দিরের দায়িত্ব আল-কুহীকে দিয়েছিলেন।

গণিতে তিনি আরকিমিডিস ও এ্যাপোলনের সমীকরণ সমস্যার সমাধান করেন যার ফলে দ্বিতীয় ডিগ্রি থেকে উচ্চতর ডিগ্রি সমীকরণের সূত্রপাত ঘটে। তিনি এসবের কিছুটা সমাধানসহ আরও বেশী সমাধানের পথ উম্মোচন করেন।

আল-সিজ্জি

আবু সাঈদ হামিদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল জলিল আল-সিজ্জি ছিলেন সিজিস্থানের অধিবাসী। তিনি ৯৫১ থেকে ১০২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই বিশিষ্ট গাণিতিক, "কনিক সেকসন" ও বৃত্তের উপর গবেষণা করেন। তিনি এ ক্ষেত্রে আগেকার দিনের পদ্ধতি পরিবর্তন করে শুধুমাত্র জ্যামিতির মাধ্যমে সমাধান করতে সচেষ্ট হন, যা পরবর্তীতে সবাই গ্রহণ করেন।

আব্দুর রাহমান আস-সূফী আর-রাজি

মুসলিম বিশ্বের এই প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পূর্ণ নাম হলো- আবুল হাসান আব্দুর রাহমান ইবনে উমর আস-সুফী আর-রাজি। রায় নামক স্থানে ৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয় ও ৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

আস-সুফী সুলতান শরাফ উদ-দৌলার বন্ধু ও মাষ্টার ছিলেন। তাঁর মূল্যবান গ্রন্থের নাম হলো "স্থির তারকাদের পুস্তক", যা ছিলো মুসলিম বিশ্বে মহাকাশ পর্যবেক্ষণের তিনটি প্রধান গ্রন্থের একটি। বাকি দু'টির লেখক ছিলেন যথাক্রমে, ইবনে ইউনুস (একাদশ শতাব্দির প্রথমার্ধে লিখিত) ও উলুগ বেগ (পঞ্চদশ শতাব্দির প্রথমার্ধে লিখিত)।

ইবনে আল-আলম

সুলতান শরাফ উদ-দৌলার দরবারে এই মুসলমান জ্যোতির্বিজ্ঞানী কাজ করেন। ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে তাঁর মৃত্যু হয়। এ বিজ্ঞানী অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মহাকাশ পর্যবেক্ষণে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত তারকাদের ডাটা টেবিল পরবর্তী দুই শতাব্দি পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

আস-সাগানি

তাঁর প্রকৃত নাম হলো, আবু হামিদ ইবনে মুহাম্মদ আস-সাগানি আল-আস্তুরলাবি। তিনি মার্ভ এর নিকটে সাগান নামক স্থানে "আষ্ট্রলেব" তৈরী করতেন বলে তাঁর নামের শেষে "আল-আস্তুরলাবি" কথাটা সংযুক্ত হয়। ৯৯০-তে তাঁর মৃত্যু হয় বাগদাদে। তিনি একজন গাণিতিক ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক ছিলেন। তিনি শরাফ উদ-দৌলার পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে কাজ করেন, এবং হয়ত এ পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের যন্ত্রপাতির প্রস্তুতকারকও ছিলেন।

আবুল ওয়াফা

কুহিস্তানের বুজঝান নামক স্থানে এই প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী ৯৪০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদে বিজ্ঞানচর্চা করেন ও এখানেই ৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। আবুল ওয়াফা ছিলেন গ্রীক থেকে আরবিতে বৈজ্ঞানিক বই-পুস্তক অনুবাদকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর লিখিত অনেক বই এখন হারিয়ে গেছে, তবে "কিতাব আল-কামিল" (সম্পূর্ণ পুস্তক), "জিঝ আল-ওয়াদি" (একটি ব্যবহারিক পাটীগণিত) ও "কিতাব আল-হানডাসা" (ব্যবহারিক জ্যামিতি) প্রভৃতি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। গণিতের ট্রিগোনোমেট্রি শাখায়ও তাঁর অনেক অবদান আছে।

আল-খুজানদি

এই বিজ্ঞানীর প্রকৃত নাম হলো, আবু মুহাম্মদ হামিদ ইবনে আল-খিজির আল-খুজানদি। তিনি মূলত জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর কাজ করেন। ১০০০ ইংরেজিতে তাঁর মৃত্যু হয়। গণিত শাস্ত্রের উপরও এ বিজ্ঞানী কাজ করেন এবং দু-চারটা নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন।

আবু নাসির

তাঁর পূর্ণ নাম হলো আবু নাসির মনসুর ইবনে আলী ইবনে ইরাক। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আল-বিরুনীর মাষ্টার ছিলেন এই মুসলিম গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। গণিত শাস্ত্রে তিনি অনেক কাজ করেন। এই বিজ্ঞানীর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ ঠিক জানা যায়নি, তবে ১০০৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি কর্মরত ছিলেন।

মাসলামা ইবনে হামিদ

মুসলিম স্পেইনের রাজধানী কুর্দোভা শহরে দশম শতাব্দির শেষার্ধে এই গাণিতিক জীবিত ছিলেন। ১০০৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। স্পেনীয় মুসলমান বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম।

তিনি আল-খোওয়ারিজমির মহাকাশ টেবিলের সংস্কার করেন। এ টেবিলটি মাসলামা ফার্সী থেকে আরবিতেও অনুবাদ করেন। তিনি আষ্ট্রলেব যন্ত্রের উপরও লেখালেখি করেন যা পরবর্তীতে লেটিনে ভাষান্তরিত হয়। আলকেমী শাস্ত্রের উপর "রুবাত আল-হাকিম" ও "গাইয়াত আল-হাকিম" নামে তিনি দু'টি বই লিখেন।

আল-ক্বাবিছি

অবুল ছাকার আব্দুল আজিজ ইবনে উসমান ইবনে আলী আল-ক্বাবিছি নামক এই বিজ্ঞানী আল-ইমরানির একজন ছাত্র ছিলেন ও মসুল নামক স্থানে কাজ করেন। ৯৫৫-তে তাঁর মৃত্যু হয়। সুলতান সয়েফুদ-দৌলার দরবারেও তিনি বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করেন। আল-ক্বাবিছি একজন প্রখ্যাত মুসলিম জ্যোতিষি হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর লেখা পুস্তক; "আল-মাদকাল ইলা সিনাতান নুজুম" বা "জ্যোতিষ শাস্ত্রের কলাকৌশলের উপর একটি উপক্রমণিকা" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বইটি লেটিনে অনুদিত হয়েছিলো। রংধনুর উপর একটি সুন্দর কবিতাও এই বিজ্ঞানী লিখেছিলেন বলে জানা যায়।

রাবি ইবনে জায়িদ আল-উসকোফ

আল-উসকোফ অর্থ হলো বিশপ। তিনি স্পেনের কুর্দোভা শহরে একজন খ্রিস্টান বিশপ ছিলেন। ৯৬১ ইংরেজিতে আল-হাকাম দ্বিতীয়-এঁর দরবারে বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি কর্মরত ছিলেন। তিনি আরবি ভাষায় লিখে গেছেন। কিতাব আন-নওয়া বা "সময়ের বিভাজ্য এবং বস্তুর উপকার" নামে একটি ক্যালেণ্ডার আল-হাকামের প্রতি তিনি উৎসর্গ করেন।

হামিদ আত-তাবারি

তাবারিস্তানের আবুল হাসান হামিদ ইবনে মুহাম্মদ আত-তাবারি সুলতান রুকন-উদ-দৌলার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন ৯৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে। চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি ১০ খণ্ডে সমাপ্ত একটি বিরাট পুস্তক লিখেন। এ পুস্তকটির আরবি নাম হলো- "কিতাব আল-মুয়াল্লাজা আল-বুকরাতিয়া"।

আলী ইবনে আব্বাস আল-মাজুসি (ম্যাজিয়ান)

এ প্রখ্যাত চিকিৎসকের নাম থেকে এটাই পরিলক্ষিত হয় যে, তিনি জোরোস্তার ধর্মাবলম্বী ছিলেন- আল-মাজুসি অর্থ এটাই। পারস্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত হওয়াজ নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। ৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

এ সময়ের তিনজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের মধ্যে আল-মাজুসি একজন ছিলেন। খলিফা আব্দুদ-দৌলার জন্য "কিতাব আল-মালিকি" বা "বাদশাহী পুস্তক" নামে চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি বিশ্বকোষ লিখেছিলেন। এ পুস্তকটি আর-রাজির "হাওই" থেকে অনেকটা ছোট আকারের ছিলো, তবে আলী ইবনে সিনার "কানুন" থেকে উন্নতমানের ও আরও ব্যবহারিক ছিলো। কিতাব আল মালিকি সর্বমোট ২০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছিলো। পুস্তকের প্রথমার্ধে চিকিৎসা শাস্ত্রের থিওরী নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং দ্বিতীয়ার্ধে ঔষধের ব্যবহারিক উপায়-অবলম্বনের উপর বিস্তারিত লিপিবদ্ধ হয়েছে।

দেহের সূক্ষ্ণ শিরা উপশিরা প্রণালীর মৌলিক ধারণা, চিত্তাকর্ষক ক্লিনিক্যাল পর্যবেক্ষণ, সন্তান-প্রসবের সময় যে জরায়ুতে গতির সঞ্চার হয় তার প্রমাণ (সন্তান নিজে বের হয় না; সন্তানকে জরায়ু ধাক্কা দিয়ে বাইর করে) প্রভৃতি বিষয়বস্তু কিতাব আল-মালিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আল-কুমরী

এই বিজ্ঞানীর পূর্ণ নাম হলো- আবু মাসুর আল-হাসান ইবনে আল-কুমরী, এবং জাবাল নামক স্থানের কুম এলাকায় তাঁর জন্ম হয়। তবে তিনি বাগদাদে দশম শতাব্দির শেষের দিকে কর্মরত ছিলেন। একজন মুসলমান চিকিৎসক হিসাবে তিনি কাজ করেন। আল-কুমরী প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আলী ইবনে সিনা (আবিসিনা) এঁর শিক্ষক ছিলেন। তিনি রাজীর চিন্তাদ্বারার উপর ভিত্তি করে “কিতাব জিহনা ওয়া মানা” বা “জীবন ও মরণের পুস্তক” নামে ঔষধ-বিজ্ঞানের উপর একখানা বই লিখেন। বইটি তিন খন্ডে বিভক্ত করে লিখা হয় (ভেতরের রোগ, বাহিরের রোগ, জ্বর)।

আবু সাহল আল-মাসিহি

আবু সাহল ঈসা ইবনে ইয়াহইয়া আল-মাসিহি আল-জুরজানি (অর্থাৎ খ্রিস্টান), নামে এ চিকিৎসক কেপসিয়ান সাগরের পূর্বে অবস্থিত জুরজান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৪০ বছর বয়েসে ৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। খ্রিস্টান হলেও তিনি আরবিতে লেখালেখী করেন। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলোর মধ্যে “আল-কুতুব আল-মিয়া ফিস ছানাল তিব্বিয়া” নামে ঔষধ-বিজ্ঞানের একটি বিরাট পুস্তক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ পুস্তক’টি সুদীর্ঘ ১০০ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত করা হয় এবং আরবিতে এ ধরনের লেখা এটাই প্রথম ছিলো।

আবু সাহল আল-মাসিহি আরও কয়েকটি পুস্তক লিখেন। এর মধ্যে; হাম রোগ, সংক্রামক রোগ, নাড়ীর স্পন্দন, মানবসৃষ্টির মাধ্যমে ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রকাশ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবু মনসুর মুওয়াফফাক ইবনে আলী আল-হারাই

হেরাত নামক স্থানে শাহজাদা মনসুর ইবনে নুহ এর দরবারে এই বিজ্ঞানী কর্মরত ছিলেন। জন্মসূত্রে তিনি পারস্যদেশীয়। এ ঔষধবিৎ ফারসী ভাষায় অনেক বই-পুস্তক লিখেন। তিনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ভারতসহ সমগ্র মুসলিম জাহান ভ্রমণ করেন। তাঁর লেখা বই-পুস্তকের মধ্যে "কিতাব আল-বনিয়ান হাক্কাইক্ব আদ-দিয়া" বা "রোগ-প্রতিকারের পুস্তক" সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলো। এই বইটিতে ৫৮৫টি রোগের প্রতিকার নিয়ে আলোচনা হয়। এর মধ্যে লেখক ৪৬৬টি রোগের প্রতিকারক হিসেবে উদ্ভিদ থেকে নিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা, ৭৫টি রোগের জন্য খনিজদ্রব্য (মিনারেল) ব্যবহার এবং ৪৪টি রোগের জন্য জীব-জন্তু থেকে নিষ্কৃত ঔষধ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি ঔষধ প্রস্তুত করার বিদ্যা বা ভেষদবিদ্যার প্রবর্তক ছিলেন। আবু মনসুর সডিয়াম-কারবোনেট ও পটাসিয়াম-কারবোনেট এর মধ্যে ব্যবধান আবিষ্কার করেন ও অন্যান্য বহু রসায়ন দ্রব্যাদির উপর জ্ঞাত ছিলেন।

আল-তামিমি

এই বিজ্ঞানীর পূর্ণ নাম হলো- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হামিদ ইবনে সাঈদ আল-তামিমি আল-মুক্বাদ্দাসি। তাঁর জন্ম হয় জেরুজালেমে তবে ৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মিশরে চলে যান এবং ৯৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেথায় কর্মরত ছিলেন।

ফিলিস্তিনের চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত এ বিজ্ঞানী ভেষদবিদ্যা বা ফ্যার্মাসিউটিক্যাল বিষয়ে অনেক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি ঔষধের উপর বহু বই-পুস্তক রচনা করেন। তবে "কিতাব আল-মুরসিদ" নামে তাঁর একটি প্রধান বই ছিলো, যেটিতে তিনি উদ্ভিদ, মিনারেল (খনিজ) প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

আল-বালাদি

মিশরে কর্মরত এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ৯৯০ খ্রিস্টাব্দের দিকে জীবিত ছিলেন। তাঁর লেখা প্রসিদ্ধ বইটির নাম হলো- "কিতাব তাদবির আল-হাবালা ওয়াল আফলাল"। এ বইয়ে তিনি অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজনীয়তা এবং শিশুদের স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করেন। একমাত্র এ বইটির কারণেই এ প্রসঙ্গে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য।

হাসদাই ইবনে সাপরুত

এ বিজ্ঞানী সাফরাত, বাসরাত প্রভৃতি উপনামেও পরিচিত ছিলেন। তবে তাঁর প্রকৃত নাম হলো, আবু ইউসুফ ইসহাক ইবনে ইজরা। ৯১৫ খ্রিস্টাব্দে আন্দালুসিয়ার (স্পেন) জায়েন নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়।

স্পেনের কুর্দোভায় সুলতান আব্দুররাহমান-৩য় এর দরবারে তিনি কাজ করেন। ৯৭০ অথবা ৯৯০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। হাসদাই ইবনে সাপরুত বাস্তবে স্পেনীয় একজন ইহুদি ডাক্তার ছিলেন। তিনি বিজ্ঞানের বিশেষ অনুরাগী ব্যক্তি ছিলেন এবং গ্রীক থেকে বিজ্ঞানের বহু বই-পুস্তক আরবিতে অনুবাদ করেন। খলিফার একজন ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে, তিনি সর্বরোগ-নিবারক একটি ঔষধ আবিষ্কার করেন, যার নাম ছিলো, "আল-ফারুক" বা সর্বোৎকৃষ্ট। ৯৪৮ থেকে ৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে খলিফা আব্দুর রাহমানকে সম্রাট কন্টানটিন্স-৭তম গ্রীক বিজ্ঞানী ডিওসকরাইডিসের একটি লেখা উপহার দেন। হাসদাই ইবনে সাপরুত তখন খলিফার নির্দেশে এ লেখাটা আরবিতে ভাষান্তর করেন। অনুবাদে তাঁকে সাহায্য করেন, নিকুলাস নামে একজন গ্রীক পাদ্রী। এ পাদ্রীকে কনস্টানটি কুর্দোভায় প্রেরণ করেছিলেন ৯৫১ খ্রিস্টাব্দে, খলিফার অনুরোধে।

বিজ্ঞানী হাসদাই ইবনে সাপরুত হিবরু ভাষায় খাজরাজের বাদশাহর নিকট অনেক চিঠি দেন, এগুলোতে তিনি আন্দালুসিয়ার সমসাময়িক অবস্থা বর্ণনা করেন।

আরিব ইবনে সাদ আল-কাতিব আল-কুরতুবি

কুর্দোভার খলিফা আব্দুর রাহমান-৩য় ও আল-হাকিমের সময় এই বিজ্ঞানী কাজ করেন। ৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এই বিজ্ঞানী একজন স্পেনীয়-মুসলিম ইতিহাসবিদ ও চিকিৎসক ছিলেন, যদিও প্রাথমিক জীবনে তিনি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি ৯৬১-৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুসলিম স্পেন ও আফ্রিকার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস লিখেন। এ বইটি পরবর্তীতে বেশ প্রভাব বিস্তার করে তখনকার সময়ে। এটা ইবনুল-ইদরানি ত্রয়োদশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবহার করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইবনে সাদ ধাত্রীবিদ্যা (গাইনোকলোজী), স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান (হাইজিন) এবং ভ্রূণ-বিজ্ঞান (এমব্রিয়লজী) প্রভৃতি বিষয়ের উপর বহু লেখালেখি করেন। তাঁর লেখা "খালক আল-জানিন" বা "ভ্রূণ-সৃষ্টির পুস্তক" ও "কিতাব আন-নওয়াহ" বা "পঞ্জিকার বই" অত্যন্ত সুপরিচিত।

(চ) আল-বিরুনির সময়

এ সময়ে এসে ইসলামী বিজ্ঞান পূর্ণতাপ্রাপ্ত লাভ করে। আমরা তাই এ যুগে কয়েকজন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীদের নাম খুঁজে পাই, যাঁরা সত্যিকার অর্থে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন। আল বিরুনির যুগ ও পরবর্তীতে উমর খৈয়ামের যুগের মধ্যে বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি সাধিত হয়, পঞ্চদশ শতাব্দিতে ইউরোপীয় রেঁনেসা ছিলো এর ফলাফল। এ দু'যুগে মুসলমান বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারকে হাতিয়ার করেই কোপারনিকাস, লেনারডো ডা-ভিন্সি, গ্যালিলিও গ্যালেলাই ও আইজাক নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ইউরোপে বিজ্ঞানের নব-জাগরণের জন্ম দেন।

বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান নিয়ে ইতোমধ্যে যা আলোচনা হয়েছে, তাতে আমি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের জীবন ও কার্য নিয়ে লিখেছি। তবে এ দুযুগের ক'জন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীদের ব্যাপারে আলোচনা হবে অনেকটা ব্যাপকভাবে। এ প্রসঙ্গে এটা প্রযোজ্য বলে মনে করি।

আবুল কাসিম আল-জাহরাবি (৯৩৬ - ১০১৩ খ্রি:)

নিঃসন্দেহে মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হচ্ছেন এই ব্যক্তি, যিনি পশ্চিমে আলবুকাসিস নামে পরিচিত। তাঁর আবিষ্কৃত বহু সার্জিক্যাল অপারেশনের পদ্ধতি আজো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তিনি অস্ত্রপাচারের জন্য ব্যবহৃত অনেক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন। তবে আল-জাহরাবি তাঁর লেখা মেডিক্যাল বিশ্বকোষের জন্য সুপরিচিত। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই মুসলিম চিকিৎসককে সার্জারির জনক বলা হয়ে থাকে।

আল-জাহরাবির পূর্ণ নাম হলো, আবুল কাসিম খালাফ ইবনে আল-আব্বাস আল-জাহরাবি। স্পেনের কুর্দোভার নিকটে জাহরা নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। জাহরা তখন স্পেনের একটি প্রসিদ্ধ শহর হিসেবে মুসলিম জাহানে পরিচিত ছিলো, যার তুলনা বাগদাদ ও ইস্তাম্বুলের (কন্সটান্টিনোপল) সাথে করা হতো। স্পেনের

খলিফা আল-হাকিম-২য়- এর দরবারে, আল- জাহরাবি ডাক্তার হিসেবে কাজ করেন। এ পেশায় তিনি দীর্ঘকাল কর্মরত থাকার পর ১০১৩ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

আল- জাহরাবি একজন প্রভাবশালী চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর কাছে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের জন্যে মেডিক্যালের ছাত্ররা সমগ্র ইউরোপ থেকে আসতো। এ সময় অবশ্য কুর্দোভা ছিলো মেডিক্যাল বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল। আল-জাহরাবির মেডিক্যালের জ্ঞান গ্যালেনের তুলনায় অনেক উন্নতমানের ছিলো।

ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত বিরাট মেডিক্যাল বিশ্বকোষের রচয়িতা হিসেবে আল-জাহরাবি বেশী পরিচিত ছিলেন। এ জ্ঞানকোষের আরবি নাম হলো, “আল-তাছরিফ মান আযাজ আল্লিল তা-লিফ”, বা “বড় পুস্তক পড়তে অপারগ ব্যক্তির জন্য সাহায্য”। এ বিশ্বকোষের তিনটি খন্ড সার্জারির ওপর লিখিত। এতে আল- জাহরাবি তাঁর নিজস্ব আবিষ্কারসহ চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে দু’শ সার্জারির যন্ত্রপাতি নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। অপারেশন পদ্ধতির ব্যাপারেও এই তিন খণ্ডে তিনি আলোচনা করেছেন। এতে ব্লাডার থেকে পাথর বের করা, কান-নাক-চক্ষে অস্ত্রোপচার, ধাত্রীবিদ্যা, উদর থেকে মৃত শিশুদের বের করা, প্রয়োজনে হাত বা পা কেটে দেওয়া ও জীব-জন্তুকে কেটে মেডিক্যাল রিসার্চ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা ও আলোচনা করেন।

একজন আবিষ্কারক হিসেবে আল-জাহরাবি, তাঁর তৈরী কানের ভেতর পরীক্ষার যন্ত্রপাতি, উদর দেখার যন্ত্র ও গলা থেকে কাটা বা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক বস্তু বের করার যন্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

আল-জাহরাবিই ছিলেন প্রথম ডাক্তার যিনি অপারেশনের পর কাটা চামড়া বা দুর্ঘটনায় ফেটে যাওয়া চামড়া সেলাই করতে মশ্রিন সূতা ব্যবহার করেছিলেন। মুখের অভ্যন্তরে সার্জারি করা ও দন্তচিকিৎসার ক্ষেত্রেও আল-জাহরাবি সুদক্ষ ছিলেন। এছাড়াও জীব-জন্তুর মাড়ি ব্যবহার করে তিনি প্রাকৃতিক দন্ত প্রস্তুত করতেন।

আল-জাহরাবির মেডিক্যাল বিশ্বকোষ জেরার্ড অব ক্রেমোনা নামক এক ব্যক্তি মধ্যযুগে লেটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। তারপর এটা হিবরু, ফরাসী ও ইংরেজিতে ক্রমান্বয়ে ভাষান্তর করা হয়। ইউরোপের মেডিক্যাল বিদ্যালয়গুলোতে আত-তাছরিফ সর্বাপেক্ষা জরুরী একটি পাঠ্য পুস্তক হিসেবে কয়েক শত বছর ব্যবহৃত হয়েছিলো।

আবু রায়হান মুহাম্মদ আল-বিরুনি (৯৭৩ -১০৪৮ খ্রিঃ)

বিজ্ঞান তথা ইসলামের ইতিহাসে আল-বিরুনি নাম সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তিনি একাধারে জ্যোতির্বিজ্ঞানী, পদার্থবিৎ, চিকিৎসক, ভৌগোলিক এবং ইতিহাসবিদ ছিলেন। এই বহু-গুণসম্পন্ন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সম্পর্কে ইউরোপীয় লেখক, মেক্স মিয়েরহফ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত মুসলিম ব্যক্তিদের মধ্যে ইসলামী বিজ্ঞানের সোনালী যুগের হয়তোবা সর্বপ্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন আল-বিরুনি। মানবেতিহাসে তাঁর বহুবিধ অবধানের জন্য তাঁকে “আল-উস্তাজুল উস্তাদ” বা অধ্যাপকদের শিক্ষক বলে আখ্যায়িত করা হয়।

আবু রায়হান মুহাম্মদ আল-বিরুনির জন্ম হয় ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান উজবেকিস্তানের কারা-কালপাস্কিয়া নামক স্থানে। তাঁর জন্মের সময় এ জায়গার নাম ছিলো, খোয়ারিজ্‌ম। তিনি প্রথমে আররী ভাষা ও শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন। পরে তিনি গ্রীক, সিরিয়াক এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তখনকার দিনে জ্ঞানের মাধ্যম হিসেবে যে চারটি ভাষার ব্যবহার ছিলো- অর্থাৎ, আরবি, গ্রীক, সিরিয়াক ও সংস্কৃত-, এগুলোতে আল-বিরুনির পূর্ণ আয়ত্ব থাকায় তাঁর নিজস্ব কার্যে মৌলিকত্ব বা অরিজিন্যালিটি প্রকাশ পায়। আল-বিরুনি মনে করতেন; যে বিষয় নিয়েই কেউ কিছু গবেষণা করুক না কেন, তার উচিত এ ব্যাপারে জানা প্রতিটি তথ্য প্রথমে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা। তারপর এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে নতুন আবিষ্কারে অগ্রসর হতে হবে।

আল-বিরুনি প্রখ্যাত চিকিৎসক ইবনে-সিনার সময়ে জীবিত ছিলেন, এবং তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখতেন বলে জানা যায়। বিজ্ঞান তথা মানব-জ্ঞান প্রসারে আল-বিরুনির অবদান এত বেশী ছিল যে, তাঁর লেখার সূচীপত্র লেখতে ষাটেরও বেশী পৃষ্ঠার একখানা বইয়ের প্রয়োজন হবে। তাঁর এবং আল-হাইতামের

বৈজ্ঞানিক অবদানের ফলেই অধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে ওঠে। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর জ্ঞান-চর্চা করার পর এ স্বনামধন্য মুসলিম বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয় ১০৪৮ সনে আফগানিস্তানের গাজনা নামক স্থানে।

বিজ্ঞানে আল-বিরুনী মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ অনেক অবদান রাখেন। দিক-নির্ণয়ের ৭টি আলাদা উপায় তিনি আবিষ্কার করেন। সূর্য ও চন্দ্রের গতিবিধি এবং চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণ নিয়ে গবেষণা করেন। এছাড়াও তিনি একাধিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি আবিস্কার করেন।

পৃথিবীর মধ্যশলাকার গতি (আহ্নিক গতি) সম্পর্কে আল-বিরুনিই প্রথম আলোচনা করেন এবং লেটিচিউড ও লঙ্গিচিউড সঠিকভাবে অঙ্কর মাধ্যমে বের করতে সক্ষম হন। তাঁর এসব তথ্যাবলী স্বলিখিত পুস্তক, "আল-আতার আল-বাক্বিয়া" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়। ঘড়ির ওপর ১০০০ সনে তিনি একটি মূল্যবান বই রচনা করেন।

আল-বিরুনিই প্রথমে আবিষ্কার করেন যে, আলোর গতি শব্দের গতি থেকে বহুগুণ বেশী। মহাকাশে ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি সম্পর্কে তিনি বলেন, এগুলো হলো অগণিত তারাপুঞ্জ। ১০১৯ সনের ৮ এপ্রিল একটি সূর্যগ্রহণ ঘটেছিল। আল-বিরুনি এ সম্পর্কে তাঁর লেখায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। একই বছরের ১৭ সেপ্টেম্বরে সংঘটিত একটি চন্দ্রগ্রহণ নিয়েও তিনি লিখেছেন। তাঁর বই, "আল-তাফহিম লি-আওয়াইল সিনাতাল তানজিম" গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার ওপর লেখা। বইটি ১৯৩৪ সনে রামজি রাইট নামক একব্যক্তি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

আল-বিরুনি পদার্থ বিজ্ঞানের ওপর বেশ অবদান রেখে যান। তিনি সঠিকভাবে স্প্রিং এর কার্যকারিতার উপর গবেষণা, ১৮টি পদার্থের বিশেষ ওজন (স্পেসিফিক ওয়েট) প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর বই "কিতাব আল-জামাহির"-এ অনেক ধরনের মূল্যবান পাথর নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আল-বিরুনি গণিতের শাখাদ্বয়- ত্রিভূজ ও ট্রিগোনোমেট্রির ওপর মৌলিক অনেক তথ্য উদঘাটন করেন। ভারতে ব্যবহৃত নাম্বার সিষ্টেম নিয়েও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

জ্যামিতি শাস্ত্রের উপরও আল-বিরুনির অবদান আছে। তিনি ভৌগোলিক আগ্নেয়গিরি ও ধাতুবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেছেন। লঙ্গিচিউড ও লেটিচিউড ব্যবহার করে তিনি এক জায়গা থেকে অপর আরেক জায়গার দূরত্ব বের করতে সঙ্গম হন। আল-বিরুনি প্রাচীন সভ্যতা ও ভূগোলের ওপর একখানা পুস্তক লিখেন, যার নাম ছিলো, "আল-আতার আল-বাক্বিয়া ফী ক্বানুন আল খালীয়"।

গজনীর সুলতান মাহমুদের সাথে আল-বিরুনির ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর নামদাম ও প্রতিভা দেখে সুলতান মাহমুদ মুগ্ধ হয়ে যান এবং কয়েকবার তিনি আল-বিরুনিকে ভারতে সফরসঙ্গী হিসেবে নিয়ে যান। এর ফলে আল-বিরুনি ভারত সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন ও সুদীর্ঘ ২০ বছর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেন। হিন্দু পণ্ডিতদের কাছে তিনি দর্শন, অঙ্ক, ভূগোল ও ধর্ম বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি নিজে এর বদলে পণ্ডিতদেরকে গ্রীক ও মুসলিম বিজ্ঞান এবং দর্শন শিক্ষা দেন।

আল-বিরুনির বই "কিতাবুল হিন্দ" এর মধ্যে তখনকার ভারতীয় ধর্ম, মানবজীবন, ভাষা এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি বহুযুগ পরে আবিষ্কৃত সিন্ধু সভ্যতার লীলাভূমি হারাপ্পা ও মোহেজোদারুর অঞ্চলকে পুরাতন যুগে একটি প্রাচীন সাগর এলাকা ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। দু'টি মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থ- "পাতাল" ও "সাকেয়া", আল-বিরুনি আরবিতে অনুবাদ করেন। প্রথম বইটি মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা ও দ্বিতীয়টি সৃষ্ট বস্তু এবং এদের ধরন নিয়ে লেখা। আল-বিরুনির সময়ের ৬০০ বছর পর সম্রাট আকবরের শাসনামলে লেখা আবুল ফজলের বই, "আইন-ই আকবর" আল-বিরুনির বই কিতাব আল-হিন্দের অনুসরণেই লেখা হয়েছিল।

আল-বিরুনির সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পুস্তকের নাম হলো, "আল-কানুন আল-মাসুদি ফীল হায়া ওয়ান নুজুম"। ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে এ বইটি লিখা হয়েছিল। আল-বিরুনি এটা সুলতান মাহমুদের পুত্র সুলতান মাসুদের নামে উৎসর্গ করেন। এ পুস্তকে তিনি অঙ্ক শাস্ত্রের কয়েকটি নতুন থিওরী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু তথ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর লেখা অন্য আরো দু'টি প্রসিদ্ধ বইয়ের নাম হলো, "আল-আতার আল-বাক্বিয়া" ও "কিতাব আস-সায়্যিদিনা"। প্রথম বইটিতে আল-বিরুনি, প্রাচীন দেশসমূহের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন ও দ্বিতীয়

বইয়ে আরবি ও ভারতীয় ঔষধ-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেন এবং এ দু'টোর মধ্যে সামঞ্জস্য আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন। সিয়ামিজ টুইনস (একত্রে জোড়া লাগানো জময) ও আষ্ট্রলেব যন্ত্রের উপরও তাঁর বেশ আগ্রহ ছিলো।

আল-বিরুনি সত্যিকার অর্থে একজন মুসলিম বিজ্ঞানী ছিলেন, যাঁর প্রেরণার উৎস ছিলো কুরআনে বর্ণিত আয়াতসমূহ। আল্লাহপাক যে মানুষকে জগৎ নিয়ে গবেষণা করার তাগিদ দিয়েছেন বার বার, আল-বিরুনি তা পালন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি ও পদার্থবিজ্ঞানের ওপর গবেষণা করে এটা আমি স্পষ্টই অনুধাবন করতে পারছি যে, এ সবকিছুর পেছনে একটি অসীম শক্তিধর সত্তা আছেন, যিনি পরিকল্পনা করে এগুলো সৃষ্টি করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর আমার আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, এ বিশ্বে বহু অত্যাশ্চর্য বস্তু রয়েছে যা থেকে অনায়াসেই বুঝা যায় যে, এর পেছনে একটা সৃষ্টিশীল পরিকল্পনা কাজ করছে। যাবতীয় কিছু শুধুমাত্র বস্তুবাদী চিন্তাদ্বারা দিয়ে কখনও বুঝানো সম্ভব নয়।"

আল-বিরুনি তাঁর কার্যাবলীকে কখনও সুনাম, ধন বা ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেননি। কিতাব আল-কানুন আল-মাসুদি প্রকাশ হবার পর সুলতান মাসুদ যখন তাঁকে উপহার স্বরূপ তিনটি উট বোঝাই করে রৌপ্যমূদ্রা পেরণ করেন তখন, তিনি ভদ্রতা বজায় রেখে এ মাল ফেরৎ পাঠিয়ে বলেছিলেনঃ "হজুর! বেআদবী মাফ করবেন! আমি জ্ঞানের জন্যেই জ্ঞানের চর্চা করি, ধন-সম্পদ বা সুনাম অর্জনের জন্য নয়।"

আবু আলী আল-হুসেইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা (৯৮১ - ১০৩৭ খ্রিঃ)

পশ্চিমে আজো আবিসিনা নামে পরিচিত এই প্রসিদ্ধ মুসলমান বিজ্ঞানী তাঁর সময়ের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও দূরদর্শী চিন্তাবিদ ছিলেন। বিজ্ঞানে তাঁর অবদান ছিলো অতুলনীয়। বিশেষ করে মেডিক্যাল বিজ্ঞানে সে সময়ে তাঁর সমতুল্য কোন চিন্তাশীল কেউ ছিলেন না। এ বিষয়ে ইবনে সিনার সর্বপ্রধান অবদান হলো তাঁর লেখা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আল-কানুন ফীত্বিব"। সাধারণত এটাকে পশ্চিমে "কানুন"

বলা হয়। একমাত্র এ বইটির কারণেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানীর নাম না থাকলে সমগ্র বিষয়টিই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বুখারার নিকটে আফসানা নামক স্থানে ৯৮১ সালে আবু আলী আল-হুসেইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনার জন্ম হয়। মাত্র ১০ বছর বয়সেই তিনি কুরআন অধ্যয়ন করতে সক্ষম হন। তারপর তখনকার দিনে জানা সাধারণ বিজ্ঞানকে তিনি আয়ত্ব করে ফেলেন। আবু আব্দুল্লাহ নাতালী নামক একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিকের কাছে তিনি "লজিক", গ্রীক এবং মুসলিম দর্শনের বই-পুস্তক অধ্যয়ন করেন। অতি অল্প বয়সেই মেডিসিনের উপর তাঁর দক্ষতা ও আসক্তি পরিলক্ষিত হয় এবং নিজ এলাকায় পরিচিত হয়ে উঠেন।

ইবনে সিনা মাত্র ১৭ বছর বয়সে বুখারার বাদশাহ নূহ ইবনে মনসুরের চিকিৎসা করেন ও তাঁকে সুস্থ করে তুলেন। বাদশাহকে এর পূর্বে বহু চিকিৎসক রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বাদশাহ আরোগ্যলাভ করে নওজোয়ান ডাক্তারকে প্রতিদান দিতে আগ্রহী হলেন। ইবনে সিনা বললেন, আমাকে যদি আপনার বিরল পাঠাগারটি ব্যবহার করার অনুমতি দান করেন, তবেই আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

ইবনে সিনা পরিণত বয়েসে জুরজানে যান এবং তাঁর সময়ের আরেক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী, আল-বিরুনির সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর তিনি রায় নামক জায়গায় কিছুদিন অবস্থান করে হামদানে চলে যান। সেথায় থাকাকালেই তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক কানুন রচনা করেন। এখানে তিনি হামদানের বাদশাহ শামসুদ্দৌলার চিকিৎসাও করেন।

হামদান থেকে ইবনে সিনা বর্তমান ইরানের ইসফাহানে চলে আসেন এবং এখানে থাকাবস্থায় বহু পুস্থক রচনা করেন। ইবনে সিনা ভ্রমণ করতে ভালবাসতেন। ইসফাহানেও তাই তিনি বেশীদিন অবস্থান না করে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াবার পর শেষ পর্যন্ত হামদানে ফিরে আসেন ও ১০৩৭ সালে এখনেই মৃত্যুবরণ করেণ।

আবু আলী আল-হুসেইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনার "আল-কানুন ফীত্বিব" বা "মেডিসিনের আইন" গ্রন্থটি হচ্ছে ১০ কোটিরও বেশী শব্দে লিখিত চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি বিশ্বকোষ। অত্যন্ত পরিষ্কার ও ধারাবাহিক পন্থা অবলম্বনে লিখিত এ বিশ্বকোষে লেখক প্রাচীন মেডিক্যাল বিজ্ঞান থেকে তাঁর সময়ের মুসলিম চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন।

কানুনের বিষয়বস্তু ও লেখার পদ্ধতি সুদূরপ্রসারী ছিলো। বইটি তাই পরবর্তী ৬০০ বছর পর্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি রিসার্চ বিশ্বকোষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ইবনে সিনা এতে শুধু জানা বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত করেননি, তাঁর নিজের আবিষ্কৃত বহু নতুন তথ্য নিয়েও বইটিতে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কানুনের বিষয়বস্তুর মধ্যে সাধারণ ঔষধ, বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ্‌স (মোট সাতশত ষাটটি), মানব শরীর যেসব রোগে আক্রান্ত হয়, প্যাথোলজী, এ্যানাটমী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মেডিক্যাল বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য কানুন ছিলো অধ্যয়নের আসল গ্রন্থ।

ইবনে সিনার আবিষ্কৃত বহু তথ্য আজো পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়ে আছে। বিষেশ করে, এ্যানাটমীর বেলায় এটা সর্বজনস্বীকৃত কথা। অন্যদিকে চক্ষু বিজ্ঞান বা অপটিক্‌সে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তনিই সর্বপ্রথম চক্ষুর বিভিন্ন অঙ্কর সঠিক বর্ণনা দেন। এগুলোর মধ্যে কনজাকটিভ ফ্লোরা, কর্নিয়া, করোইড, আইরিস, রেটিনা, লেয়ার লেনস, একুয়াস হিউমার, অপটিক নার্ভ এবং অপটিক কিয়াজমা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইবনে সিনাই সর্বপ্রথম ডাক্তার ও চিকিৎসকদেরকে মানবদেহকে সুক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গবেষণা করার জন্য উপদেশ দেন। এ ব্যাপারে ধারণা ও অন্ধভাবে থিওরী সৃষ্টির পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। মানব হৃদযন্ত্রে যে বালব আছে এবং এগুলোর কারণে যে শরীরে ব্যবহৃত রক্ত আবার হৃদযন্ত্রে প্রবেশ করতে পারে না, একথা ইবনে সিনাই প্রথমে বলেন। তিনি আরও বলেন যে, মাসুল বা মাংসপেশীতে নার্ভের অবস্থান থাকায় এগুলো নড়াচড়া করে এবং এসব নার্ভের ফলেই বেদনা অনুভব করা যায়। লিভার ও কিডনীর ব্যপারে তাঁর ধারণা হলো, এগুলোর মধ্যে কোন নার্ভ নাই তবে, এসব আভ্যন্তরীণ ওরগ্যান বা যন্ত্র নার্ভ দ্বারা আবৃত (বাইরে নার্ভ) আছে।

ইবনে সিনার কানুন জেরার্ড অব ক্রেমোনা নামক একব্যক্তি দ্বাদশ শতাব্দিতে লেটিনে অনুবাদ করেন। এর পর থেকে এটা ইউরোপের স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। কানুনের জনপ্রিয়তা এতো বেশী হয়েছিলো যে, পঞ্চদশ শতাব্দির শেষ ত্রিশ বছরের মধ্যে এটার ষোলটি সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যে ১৫টি লেটিন ও একটি ছিলো হিবরু ভাষায় প্রকাশিত। এর পরে ষষ্ঠদশ শতাব্দিতে আরও ১৬ বার বইটি প্রকাশ করা হয়। ১৯৩০ সালে ক্যামেরুন গ্রনার নামক এক ব্যক্তি "এ ট্রিটিজ অন দ্যা কানুন অব মেডিসিন অব আবিসিনা" নামে পুস্তকটি ইংরেজিতে আংশিক ভাষান্তর করেন। পশ্চিমে দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দি পর্যন্ত কানুন মেডিক্যাল বিজ্ঞানের সর্বপ্রধান পাঠ্য পুস্তক হিসেবে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে। 'ইভোলোশন অব মডার্ন সাইন্স'র লেখক ডঃ উইলিয়াম অসলারের মন্তব্য হলোঃ "কানুন মেডিক্যালের বাইবেল হিসেবে যে দীর্ঘ সময় স্থায়ী ছিলো, তা অন্য কোন লেখা অতিক্রম করতে সমর্থ হয়নি।"

কানুন ছাড়াও ইবনে সিনা "কিতাব আস-শিফা" বা "নিরাময়ের পুস্তক" নামে একটি দর্শনের বিশ্বকোষের রচয়িতা ছিলেন। এ বৃহৎ গ্রন্থে দার্শনিক জ্ঞান থেকে বিজ্ঞান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে লেখক এ্যারিস্টটেলিয়ান ঐতিহ্য, নিও-প্লেটোনিক প্রভাব ও মুসলিম ধর্মজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য সন্ধান করেছেন। কিতাব আস-শিফা ছাড়াও ইবনে সিনার লেখা, "আন-নাযাত" ও "ইশারাত" নামে দর্শনের আরও দু'টি পুস্তক প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি দর্শনের যাবতীয় বিষয়বস্তুকে দু'টি ভিন্ন ধারায় আলাদা করে দেখেছেন; ধার্মিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান। এর প্রথমটির মধ্যে যেসব বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত আছে তা হলো নীতিবিজ্ঞান (ধর্মজ্ঞান), অর্থনীতি ও রাজনীতি, আর দ্বিতীয়টির মাঝে আছে পাদার্থ বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র ও অধিবিদ্যা (মেটাফিজিক্স)।

আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে ইয়াহইয়া আয-জারক্বালী (১০২৮ - ১০৮৭ খ্রিঃ)

এই বিজ্ঞানী পাশ্চাত্য জগতে আরজাকেল নামে সুপরিচিত। মুসলিম স্পেনে তিনি একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। টলেডো নামক জায়গায় আল-জারক্বালী

কিছু মূল্যবান মহাকাশ-পর্যবেক্ষণ করেন এবং এ তথ্যগুলো তাঁর সুখ্যাত 'টলেডান টেবিল' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। আল-খোওয়ারিজমী ও টলেমীর প্রকাশিত অনেক ভূগৌলিক তথ্য তিনি সংগ্রহ ও সংস্কার করে নিজে প্রচার করেন। আল-জারক্বালীর টলেডান টেবিল দ্বাদশ শতাব্দিতে লেটিন ভাষায় তরজমা করা হয়।

আল-জারক্বালীই ছিলেন প্রথম বিজ্ঞানী যিনি সৌরজগৎ ও তারার মধ্যে যে আপেক্ষিক গতি নিহিত আছে তা প্রমাণ করেন। তিনি অঙ্ক কষে এ গতির রেইট ১২.০৪ সেকেন্ড (ডিগ্রীর অঙ্ক) প্রতি বছর বলে সাব্যস্ত করেন যা ছিল বর্তমান রেইট ১১.৮ সেকেন্ড এর কাছাকাছি। সাফিহা নামে একটি পাতলা সমতল আষ্ট্রলেব আল-জারক্বালী আবিষ্কার করেন। এ যন্ত্রটি পরবর্তীকালে ইউরোপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপারনিকাস তাঁর লেখা, "ডি রিভোলুশোনিবাস অরবিয়াম সেলেসটিয়াম" গ্রন্থে আল-জারক্বালী ও আল-বাতানী (আরেকজন বড় মুসলিম বিজ্ঞানী)- এদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। আল-জারক্বালী পশ্চিমে এতো বেশী জনপ্রিয় ছিলেন যে, তাঁর সম্মানে উনিশ শতকের কিছু বিজ্ঞানীরা চন্দ্রের একটি জায়গার নাম তাঁরই নামানুসারে নামকরণ করেন আরজাকেল এলাকা।

(ছ) উমর খৈয়ামের যুগ

উমর খৈয়াম (১০৪৪ - ১১২৩ খ্রিঃ)

‘রুবাইয়াত’ এর লেখক উমর খৈয়ামকে যদিও আমরা একজন প্রসিদ্ধ কবি হিসেবেই জানি, তথাপি উমর খৈয়াম প্রকৃত প্রস্তাবে একজন বিজ্ঞানীও ছিলেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাদ্বারা আসলে এতো সুদূরপ্রসারী ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এর ফলে বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদরা মুসলিম বিজ্ঞানচর্চার একটি যুগকে তাঁর নামানুসারে নামকরণ করেছেন। এ যুগ তাঁর জন্মকাল থেকে উলুগ বেগ (পঞ্চদশ শতাব্দির প্রথমার্ধ) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ যুগে মুসলিম জাহানে যেসব প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীদের অবির্ভাব ঘটে এদের মধ্যে ইমাম আল-গাযযালী, ইবনে জহুর, আল-ইদ্রিসি, ইবনে রুশদ, আল-বিরতুজী, নাফিজ দামেস্কী, ইবলে খালদুন প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনশাআল্লাহ! এ শেষ যুগের উল্লেখিত সব বিজ্ঞানীদের নিয়ে একে একে আলোচনা হবে।

উমর খৈয়ামের পূর্ণ নাম হলো, গিয়াস উদ্দীন আবুল ফাতেহ উমর ইবনে ইব্রাহীম আল-খৈয়াম। বর্তমান ইরানের খোরাশান প্রদেশের রাজধানী নিশাপুরে ১০৪৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। উমর খৈয়াম একাধারে একজন গাণিতিক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ ও কবি ছিলেন। তাঁর নামের অর্থ (খৈয়াম) হচ্ছে, তাঁবু নির্মাতা। সাধারণত উমর খৈয়ামকে একজন পারস্য ব্যক্তি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তথাপি তিনি আরবের খৈয়ামী বংশোদ্ভুত হতে পারেন বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। তাঁর জীবনের প্রাথমিক পর্যায় সম্পর্কে অল্পই জানা যায়। তবে তিনি নিশাপুরেই লেখাপড়া করেন এবং এখানে ও পরে সমরকন্দে তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি নিজাম আল-মুলক তূসী- এর সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উমর খৈয়াম বাদশাহ্‌র দরবারে থেকে শান্তিময় জীবন-যাপন করেননি। তিনি তখনকার দিনের শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র সমরকন্দ, বুখারা, বলখ ও ইসফাহানে ভ্রমণ করেন। তাঁর এ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের অন্বেষা ও নামকরা চিন্তাবিদদের সাথে সাক্ষাৎলাভ করা। উমর খৈয়াম ১১২৩ বা ১১২৪ সনে জন্মস্থান নিশাপুরেই মৃত্যুবরণ করেন।

উমর খৈয়াম বীজগণিতে বেশ অবদান করে গেছেন। এ বিষয়ের সমীকরণগুলোকে তিনি তালিতাভূক্ত করেন এবং সমাধান বের করার চেষ্টা চালান। কিউবিক বা তৃতীয় ডিগ্রী বীজগণিতের সমীকরণের জ্যামিতিক সমাধান তিনি করেছেন ও অন্যান্য আরোও সমাধান-কল্পে কাজ করেন। তাঁর পুস্তক, “মাক্বালাত ফীল জাবুর ওয়াল মুক্বাবিলা” ছিলো বীজগণিতের একটি মূল্যবান বই, যার ফলে পরবর্তীতে এ্যালজেবরা বা বীজগণিতের উন্নতি সাধন হয়। উমর খৈয়াম ১৩টি ভিন্ন ৩য় ডিগ্রী সমীকরণ আবিষ্কার করেন। তিনি শুধু বীজগণিতের উপরই কাজ করেননি, গণিতের অপর প্রধান শাখা জ্যামিতি নিয়েও তিনি মূল্যবান গবেষণা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ইউক্লিডের থিওরীবলী অধ্যয়ন করেন ও সমান্তরাল রেখা সম্পর্কে গাণিতিক মূল্যবান অবদান রাখেন।

১০৭৪ সালে সুলতান মালিক শাহ জালাল উদ্দীন উমর খৈয়ামকে “রায়” অবজারভেটরীর (মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র) দায়িত্ব দেন। একটি নির্ভুল সূর্য-পঞ্জিকা (সলার-ক্যালেন্ডার) তৈরীর জন্য তাঁকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। উমর খৈয়াম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাঁর এ দায়িত্ব পালন করেন ও “তারিখাল জালীল” নামে একটি সূক্ষ্ম পিঞ্জিকা তৈরী করেন। এটির মধ্যে ৩,৭৭০ বছরে একদিনের ব্যবধান হয় মাত্র। এ পঞ্জিকা বর্তমানে ব্যবহৃত “গ্রেগোরিয়ান” (খ্রিস্টান পউপ গ্রেগোরি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত) ক্যালেন্ডার থেকেও উন্নতমানের ছিলো। গ্রেগোরিয়ান পঞ্জিকায় ৩,৩৩০ বছরে একদিনের ব্যবধান হয়।

উমর খৈয়াম বিজ্ঞানী হিসেবে মূলত একজন গাণিতিক ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁর আগ্রহ ছিল। তবে অধিবিদ্যার (মেটাফিজিক্স) উপর তাঁর অবদান আছে। এ বিষয়ের উপর তাঁর লেখা দু'টি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়; “রিসালা দার উজুদ” ও সম্প্রতি আবিষ্কৃত “নওরোজনামা।”

একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ছাড়াও উমর খৈয়াম কবিও ছিলেন। এ ব্যপারে পাঠকরা অবশ্যই অবগত আছেন। বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে উমর খৈয়ামের নাম, ১৮৩৯ সনে যখন এডওয়ার্ড ফিযজারেল্ড “রুবাইয়াত” এর ইংরেজি অনুবাদ করে প্রকাশ করেন তখন থেকে সুপরিচিত হয়ে ওঠে। তাঁর এ কাব্যগ্রন্থ পৃথিবীর একটি অন্যতম ক্লাসিক সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছে।

উমর খৈয়াম কবিতা ও বিজ্ঞানের উপর অনেক বই লিখেছন। এর মধ্যে ১০টি পুস্তকের খবর সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে। এগুলোর মধ্যে চারটি অঙ্ক শাস্ত্রের উপর, তিনটি ফিজিক্স বা পদার্থ বিজ্ঞানের উপর, তিনটি অধিবিদ্যা নিয়ে, একটি বীজগণিতের উপর ও একটি জ্যামিতির উপর লেখা।

রেনি ডেসকার্টের পূর্ব পর্যন্ত উমর খৈয়ামের গণিত অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলো। বাস্তবে গাণিতিক হিসেবে তাঁর সুনামকে কবি হওয়ার মহাত্ম্য আড়াল করে রেখেছে। তবে এ দু'টি বিষয়েই উমর খৈয়াম দক্ষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। একই সময়ে কোন এক ব্যক্তি সফল কবি ও বিজ্ঞানী হওয়া ইতিহাসে খুবই বিরল।

ইমাম আবু হামিদ আল-গায্যালী [রহঃ] (১০৫৮-১১১১ খ্রিঃ)

ইরানের খোরাসান প্রদেশে ইমাম আবু হামিদ ইবনে মুহাম্মদ আত-তূসী আস-শাফিয়ী আল-গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১০৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত ছোট থাকতেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। নিশাপুর ও পরে বাগদাদে তাঁর লেখাপড়া হয়েছিল। এ প্রসিদ্ধ জ্ঞান তাপস অল্প দিনের মধ্যেই সুপরিচিত হয়ে ওঠেন ও বাগদাদের নিযামীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত হন। এ বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানদের জ্ঞানচর্চার সোনালী যুগে একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। আল-গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সেখানে ধর্ম ও দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

কিছুদিন পরে কিন্তু তিনি এ একাডেমিক জীবন ছেড়ে জ্ঞানের আরও অন্বেষায় জাগতিক সংসার ত্যাগ করে যাযাবর সন্যাসীর মত বেরিয়ে পড়লেন। এ সময়ে তাঁর জীবনে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। আধ্যত্মিকতায় তিনি উচ্চ মার্গে অধিষ্ঠিত হলেন। এরপর আবার শিক্ষাজীবনে ফিরে এসেও ঠিকে থাকতে পারলেন না, বরং একাকী জীবন কাটাতে লাগলেন ও লেখালেখির উপর মনোনিবেশ করলেন। ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বহু প্রসিদ্ধ পুস্তকের প্রণেতা। ১১১১ সালে বাগদাদে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইমাম গায্যালীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বড় অবদান ছিল ধর্ম, দর্শন ও সুফী তত্ত্বের উপর। এ সময়ে একাধিক মুসলিম দার্শনিক খুব বেশী করে নিও-প্লেটোনিকসহ গ্রীক দর্শনের অনুসরণ করছিলেন। এর ফলে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের সাথে একটা সংঘাতের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। একই সময় সুফীদের ভাবধারা ও কার্যাবলীর উপর ভীষণ চাপের সৃষ্টি হয়। তাঁদের ব্যাপক প্রচারণা ও জনপ্রিয়তা হেতু বিভিন্ন সুলতান ও কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রতি ক্ষেপে গেলেন ও তাঁদের পদ্ধতি অবলম্বনে সাধারণ মুসলমানদের ক্ষতি হবে বলে প্রচারণা শুরু করে দিলেন। ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এসব সমস্যা অবলোকন করে ধর্ম, দর্শন ও সুফিতত্ত্বের মধ্যে যে একটি সামঞ্জস্য নিহিত আছে তা বুঝিয়ে দিতে ব্রত হলেন। ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেও একজন উচ্চ মার্গের সুফী ছিলেন।

দর্শনের ক্ষেত্রে ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গণিত ও বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন। তবে এ্যারিস্টটেলিয়ান ও নিও-প্লেটোনিক দর্শনের ফলে ইসলামের উপর যে সংঘাতের সৃষ্টি হচ্ছিল তা তিনি দক্ষতার সাথে নির্মূল করতে সক্ষম হন। অন্যান্য সমকালীন মুসলিম দার্শনিক- যেমন ফারাবী ও ইবনে সিনা, এদের চিন্তাদ্বারায় যেসব ভুল ছিল তা তিনি সংস্কার করেন। ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কার্য-কারণ দ্বারা অসীমত্ব ও পরম সত্ত্বাকে প্রমাণ করার কোন উপায় নেই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই এগুলোর বাস্তবতা উপলব্ধি সম্ভব, যা হলো সুফীদের রাস্তা। ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কার্য-কারণ ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক ও সামঞ্জস্যতা সন্ধান করেছেন, এবং কার্য-কারণ নীতির সীমাবদ্ধতা সমীমে ও ধর্মের বিস্তৃতি অসীম পর্যন্ত বিদ্যমান আছে বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হন।

ধর্মের ব্যাপারে সুফীতত্ত্বের সীমালংঘনকে তিনি বন্ধ করেন ও ইসলামের মৌলিকত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। অথচ, আধ্যাত্মিকতা তথা প্রকৃত হক্বপন্থী সুফীতত্ত্বের গুরুত্ব যে আছে তা তিনি উপলব্ধি করেন। ইমাম গাযযালীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মতে আধ্যাত্মিকতা ছাড়া ধার্মিকতা পূর্ণতা লাভ করে না। ধর্মের করণীয় হুকুম-আহকাম হচ্ছে গাছের খোলসের মত আর সত্যিকার হক্বপন্থী সীমালংঘনহীন আধ্যাত্মিকতা তথা সুফী তরীকা হলো ঐ গাছের ভেতর বা আভ্যন্তরীণ অঙ্ক স্বরূপ। সুতরাং ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইসলামী

শরিয়তের ভেতরই যে সুফীদের স্থান তা তিনি সুন্দরভাবে প্রকাশ-প্রচার করে গিয়েছেন।

বাস্তবে একমাত্র সুফীদের রাস্তায়ই প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তাই ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বয়ং নিজেও এ পথের পথিক ছিলেন। বিজ্ঞান ও কার্য-কারণ নীতির মাধ্যমে এ সত্যকে আবিষ্কার সম্ভব নয়, কারণ প্রকৃত সত্য অসীমের সাথে সংপৃক্ত আর কার্য-কারণ সসীমে সীমাবদ্ধ।

ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বহু মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। প্রায় হাজার বছর পূর্বে লিখিত তাঁর বহু গ্রন্থাবলী আজো সমগ্র বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত হচ্ছে। তাঁর কালজয়ী পুস্তকগুলোর মধ্যে, "তাহাফুতুল ফালাসিফা" বা "দার্শনিকদের অসংলগ্নতা", "ইহইয়াউ উলুমুদীন" বা "ধর্মবিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ" প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর তাঁর লেখা একটি বই আছে।

ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর প্রভাব আজো বিদ্যমান আছে। তিনি ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রধান চিন্তাবিদ- ধর্ম ও দর্শন এ উভয় ক্ষেত্রে। তাঁর চিন্তাদ্বারা ইউরোপে ব্যাপকভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অর্থডক্স (মৌলবাদী) খ্রিস্টবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা থমাস একুয়াইনাস ইমাম গাযযালীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ধর্মের পক্ষে তাঁর যুক্তি এতই শক্তিশালী ছিল যে, কোন কোন চিন্তাবিদ বলেছেন, এর ফলে দর্শনের উপর বিরাট ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল, যা থেকে দর্শন আজো মুক্তি পায়নি। ইমাম গাযযালীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি চিন্তাদ্বারা ও বর্তমান দর্শনের উপর গভীর অধ্যয়ন করলে এ সত্য সহজে বুঝতে পারা যায়। বাস্তবে আজ পর্যন্ত তাঁর ধর্মের ব্যাপারে হাক্বিকাতের যুক্তির সম্মুখে কোন দর্শন ও বিজ্ঞান চ্যালেঞ্জ করতে অসমর্থ হয়েছে।

আবু মারওয়ান আব্দুল মালিক ইবনে জোহর (১০৯১ - ১১৬১ খ্রিঃ)

পশ্চিমে ইবনে জোহরকে আবেনজোর নামে অভিহিত করা হয়। মধ্যযুগে এ মুসলমান মনীষী একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার হিসেবে সর্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। মুসলমান চিকিৎসকদের মধ্যে তাঁর অবস্থান বাগদাদের আল-রাজীর পরেই আসে বলে ইতিহাসবিদরা বলেছেন। তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

ইবনে জোহর মুসলিম স্পেনের সেভিলে ১০৯১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুর্দোভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন ও এর পরে কিছুদিন বাগদাদ ও মিশরের কায়রোতে অবস্থান করে স্পেনে ফিরে আসেন। সুলতান আব্দুল মুমিনের দরবারে তিনি রাজ-চিকিৎসক ও মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেন। সেভিল শহরে থেকেই তাঁর কর্মময় জীবন অতিবাহিত করে, ১১৬১ সালে এখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

এ সময়ের অন্যান্য মুসলিম বিজ্ঞানীদের মত বিভিন্ন শাখায় জড়িত না হয়ে শুধুমাত্র মেডিসিনের উপরই ইবনে জোহর গবেষণা করেন। তবে একটিমাত্র বিষয়ে মনোনিবেশ করায় তিনি এমন কিছু মৌলিক অবদান করেছিলেন যা মানবকল্যাণে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠেছিল। হিস্টোরী অব মেডিসিনের লেখক ডঃ নিউবার্গার ইবনে জোহর সম্পর্কে বলেছেন, "এ্যানাটমীর উপর ইবনে জোহরের গভীর জ্ঞান ছিল। তাছাড়া তাঁর অস্ত্রোপচার পদ্ধতি ছিল চমৎকার।"

চিকিৎসক হিসেবে ইবনে জোহর অনেক নতুন উপায়-উপকরণ উদঘাটন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম মানুষকে ওষুধ সেবন করার পূর্বে জীব-জন্তুকে তা সেবন করে পরীক্ষা করে দেখার পদ্ধতি ব্যবহার করেন। মেডিসিনের বিজ্ঞানীরা আজো এ উপায় অবলম্বন করে থাকেন।

ইবনে জোহর বহু মূল্যবান বই-পুস্তক লিখেছেন। ডাক্তার ও চিকিৎসকদের জন্য যেমন তিনি লিখেছেন, তেমনি সাধারণ লোকদের ব্যবহারের জন্যও লিখেছেন।

তাঁর অনেক গ্রন্থ লেটিন ভাষায় অনুদিত হয়েছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দি পর্যন্ত এগুলো ইউরোপের সর্বত্র জনপ্রিয় ছিল। তবে এখন মাত্র তিনটি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়। "কিতাব আত-তাইছির ফীল মুদাওয়াত ওয়াত তদবীর" বা "ডায়েট ও থেরাপীর উপর সাধারণ পুস্তক" নামে একটি বই ইবনে জোহর, ইবনে রুশদ এর অনুরোধে লিখেন। তাঁর লেখা দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম হলো, "কিতাব আল-ইকিসাদ ফী ইসলাল আনফুস ওয়াল আছজাদ" বা "দেহ ও আত্মার সংস্কারের জন্য মধ্যম পথ অবলম্বনের গ্রন্থ"। মনোবিজ্ঞানের মাধ্যমে চিকিৎসা-পদ্ধতি নিয়ে অত্যন্ত সরল ভাষায় ইবনে জোহর এ পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ইবনে জোহরের লেখা তৃতীয় বইটির নাম হচ্ছে, "কিতাব আল-আগযিয়া" বা "আহার-দ্রব্যাদির পুস্তক"। এ বইয়ে তিনি বহু ড্রাগস ও সঠিক খাবার সামগ্রী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রে ইবনে জোহরের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এ প্রভাব সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিস্তারলাভ করে।

আল-ইদ্রিসী (১০৯৯ - ১১৬৬ খ্রিঃ)

আল-ইদ্রিসী পশ্চিমে "ড্রেজেজ" নামে পরিচিত। মুসলিম স্পেনের সিউটা নামক স্থানে ১০৯৯ সনে আল-ইদ্রিসীর জন্ম হয়।

আল-ইদ্রিসীর পূর্ণ নাম বেশ লম্বা- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ইদ্রিস আশ-শরীফ। তাঁর অন্য আরেকটি ছোট নাম আছে; আশ-শরীফ আল-ইদ্রিসী আল-কুরতুবী। তবে আমরা তাঁকে আল-ইদ্রিসী বলেই সম্ভোধন করবো।

আল-ইদ্রিসী স্পেনের কুর্দোভায় লেখাপড়া করেন। তিনি ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যে ইউরোপসহ বহু দেশে ভ্রমণ করেন। তাঁর সময়ের পূর্বেই অনেক মুসলিম বিজ্ঞানী পৃথিবীর আয়তন সুক্ষ্মভাবে পরিমাপ করেন। তখন সমগ্র পৃথিবীর একাধিক ম্যাপও পাওয়া যেত। আল-ইদ্রিসী এসব জানা তথ্য ও নিজের থেকে আবিষ্কৃত আরও তথ্য নিয়ে ভূগোল বিষয়ে বিশেষ উন্নতিসাধন করেন।

তখনকার দিনে পৃথিরীর জানা ভূখণ্ডাবলী ও সাগরসমূহের উপর আল-ইদ্রিসীর জ্ঞান থাকায়, তাঁর কার্যের প্রতি সমূদ্র নাবিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। এর ফলে অচিরেই তিনি সর্বত্র পরিচিত হয়ে উঠেন। তবে আল-ইদ্রিসীর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কীর্তি হলো তাঁর সৃষ্ট ৪০০ কেজি ওজনের রূপার একটি ভূ-গোলক। এ গোলকে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ৭টি মহাদেশের বাণিজ্য-পথ, বড় বড় হ্রদ ও নদ-নদী, প্রধান শহরসমূহ, বড় বড় সমতলভূমি, সাগর-মহাসাগর ও পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি অঙ্কন করেন। গোলকের মধ্যে তিনি এসব এলাকার আপেক্ষিক দূরত্বও লিখে দেন। আল-ইদ্রিসী তাঁর এ গোলকের সাথে "কিতাব আর-রুজারী" নামে একখানা বইও প্রকাশ করেন।

আল-ইদ্রিসী "নুযাত আল-মুসতাক ফী ইকতিরাক আল-আফাক" বা "যে আবহাওয়ার উপর দিয়ে ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক তার জন্য পরমানন্দ" নামে একটি ভূগোলের বিশ্বকোষ প্রকাশ করেন। তাঁর আরেকটি এরূপ বিশ্বকোষের নাম হলো, "রাওদুন্নাস ওয়া নুযাতান্নাফ্স" বা "মানুষের আনন্দ ও আত্মার পরমানন্দ"। এ বিশ্বকোষদ্বয়ে আল-ইদ্রিসী তাঁর সময় পর্যন্ত ভূগোলের যাবতীয় জ্ঞান লিপিবদ্ধ করেন।

ঔষধী বৃক্ষ-তরু-লতার উপর আল-ইদ্রিসী উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। এ বিষয়ে তিনি একাধিক পুস্তক রচনা করেন। তছাড়া তাঁর সময়ে জানা মুসলিম চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রাপ্ত জাবতীয় ঔষধ-পত্রের উপর তিনি গবেষণা করেন ও নিজ থেকে আবিষ্কৃত আরও বহু ঔষধ সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষকে জানান। আল-ইদ্রিসী এসব ড্রাগসের কথা তখনকার পৃথিবীর কয়েকটি প্রসিদ্ধ ভাষায় ব্যক্ত করেন। আরবি, সিরিয়াক, ফার্সী, সংস্কৃত, গ্রীক ও লেটিন ভাষায় এসব ড্রাগসের নামগুলো তিনি উল্লেখ করেন।

আল-ইদ্রিসী একজন ভৌগোলিক হিসেবে ইউরোপে যেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তাঁর আগে বা পরে কোন মুসলিম ভৌগোলিকের সেরূপ পরিচিতি ঘটেনি। তাঁর একাধিক পুস্তক লেটিন ভাষায় অনুদিত হয়, এবং এগুলো কয়েক শতবছর ইউরোপীয় নাবিকরা সমূদ্রপথে চলার জন্য ব্যবহার করেন। আমেরিকার কথিত আবিষ্কারক ক্রিষ্টোফার কলোম্বাস আল-ইদ্রিসীর তৈরী মানচিত্র ব্যবহার করেছিলেন বলে জানা যায়। এখানে উল্লেখ্য, আল-ইদ্রীসি আমেরিকা সম্পর্কে না

জানলে তাঁর মানচিত্রে আমেরিকার নক্সা এল কোত্থেকে? সুতরাং একথা সহজেই প্রমাণিত হয় যে, আমেরিকার আবিষ্কাকর মুসলমানরা ছিলেন। কলোম্বাস অনেক পরে সেখানে সমুদ্রপথে গিয়ে পৌঁছেছিলেন মাত্র। ১১১৬ সালে এ প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী মৃত্যুবরণ করেন।

আমরা আন্দালুচিয়ার উপর লিখিত আলাদা পরিচ্ছেদে স্পেনের মুসলিম বিজ্ঞানচর্চার উপর আরও আলোকপাত করেছি। আল-ইদ্রীসিসহ আরও কয়েকজন মুসলিম বিজ্ঞানীর কথা সেখানেও বর্ণিত হয়েছে।

আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে রুশদ (১১২৮ - ১১৯৮ খ্রিঃ)

"মহান মন্তব্যদাতা" নামে খ্যাত এ মুসলমান বিজ্ঞানীকে পশ্চিমে 'আভেরস' বলে ডাকা হয়। বিজ্ঞান ও দর্শনে ইবনে রুশদের প্রভাব আজো স্থায়ী আছে। তাঁর সুন্দর জীবন একজন আদালতের সম্মানিত জজ হিসেবে কাটে। তবে তিনি ডাক্তার হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর এ্যারিষ্টটলের দর্শনের উপর আলোচনা-সমালোচনা ও মন্তব্য ছিল সুদূরপ্রসারী এবং বিশেষ করে ইউরোপে অত্যন্ত প্রভাবশালী। ইবনে রুশদের দার্শনিক চিন্তাধারা মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা কট্টরপন্থী রক্ষণশীল পাদ্রীদের মনকে পর্যন্ত কম্পিত করতে সক্ষম হয়। খ্রিস্টান মৌলবাদী দার্শনিক সেন্ট থমাস এ্যাকুনাসের মত ব্যক্তিও এ প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। একই সময়ে মানুষ ইবনে রুশদ এর নিকট মেডিসিনের জন্য এবং আইনের ব্যাপারে পরামর্শ নিতে যেত।

হিজরী ৫২০ সনে (১১২৮ খ্রিস্টাব্দ) স্পেনের কুর্দোভায় একটি সভ্রান্ত সুশিক্ষিত মুসলিম পরিবারে ইবনে রুশদ এর জন্ম হয়। তিনি ধর্ম, মেডিসিন, গণিত ও দর্শন শাস্ত্রের উপর লেখাপড়া করেন। ইবনে বাজা ও আবু জাফর হারুন নামে দু'জন পন্ডিতের নিকট ইবনে রুশদ দর্শন অধ্যয়ন করেন।

সাতাশ বছর বয়েসে ইবনে রুশদকে মরোক্কোর মারাকাস শহরে ইসলামী একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলার জন্য আমন্ত্রিত করা হয়। ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দে সেখানকার সুলতান ইউসুফের অনুরোধে, ইবনে রুশদ ও আরেক প্রসিদ্ধ দার্শনিক ইবনে তোফায়েল, এ্যারিষ্টটলের দর্শনের উপর গবেষণা আরম্ভ করেন।

৪৪ বছর বয়েসে ইবনে রুশদকে সেভিলে জজ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ বছরই তিনি এ্যারিষ্টটলের "ডি এ্যানিমা" বা "জন্তু" বইটি আরবিতে অনুবাদ করেন। দু'বছর মারাকাসে অবস্থান করে তিনি নিজ জন্মস্থান কুর্দোভায় ফিরে আসেন ও এখানেই পরবর্তী ১০ বছর জজ হিসেবে কাজ করেন। ইবনে রুশদ এ সময়ে এ্যারিষ্টটলের উপর মন্তব্য ও অধিবিদ্যার গবেষণা শুরু করেণ।

ইবনে রুশদ ইসলামের শরীয়ত ও ফেকাহ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। যার ফলে তাঁকে প্রধান কাজীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ইবনে রুশদ বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্মজ্ঞানের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সন্ধান করেছেন। তাঁর পূর্বে ইবনে সিনাও এ সন্ধানে ব্রত ছিলেন। এ হিসেবে ইবনে সিনার প্রভাব তাঁর মধ্যে বেশ প্রবল ছিল বলা যায়। ইবনে রুশদ বহু পুস্তক রচনা করেছেন। ফ্রান্সের দার্শনিক রেইনার মতে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ৭৮ খানা পুস্তকের রচয়িতা ছিলেন।

ইবনে রুশদ সম্পর্কে ভাল করে গবেষণা করলে বুঝা যায় যে, তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর কিছু লেখা একটা কথা এখানে উদ্ধৃত করা যায়ঃ "যদি কেহ মানবদেহ সম্পর্কে গবেষণা করে, তবে অসীম ক্ষমতাধর আল্লাহর প্রতি তার ঈমান সহজেই বৃদ্ধি পাবে।" তাঁর মেডিক্যাল ও দর্শনের উপর লেখার মধ্যে বিভিন্ন তথ্য নিয়ে আলোচনায় কুরআন ও সুন্নাহর উদ্ধৃতি দিয়েছেন বলে দেখা যায়।

ইবনে রুশদ বলেন, মানুষ সত্যিকার শান্তি অর্জন করে মানসিক অবস্থা ও হৃদয়কে সুস্থ রাখার মাধ্যমে। আর এ সুস্থতা অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহর একত্বের প্রতি গভীর ঈমান আনয়ন। ইবনে রুশদ আরও বলেছেন, ইসলামের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করা। এ উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে দু' ধরনের পথ অবলম্বন করতে হবেঃ (১) আইন-বিজ্ঞান, যার আওতাভূক্ত হলো মানবজীবনের ব্যবহারিক বস্তু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি, ও (২) আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান- এতে আছে ধৈর্য, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, নৈতিকতা, পারলৌকিক শান্তির অন্বেষা প্রভৃতি বিষয়াদি। আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে তিনি তাক্বওয়া বা ধার্মিকতা ও প্রভুভীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, যা পবিত্র কুরআন শরীফে উল্লেখিত হয়েছে।

দর্শনে ইবনে রুশদ এর লেখা বই "তাহাফুতুল তাহাফুত" বেশ বিতর্কের সৃষ্টি করে। তিনি ইমাম আল-গাযযালীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এ গ্রন্থ রচনা করেন। এ পুস্তকে তিনি বলেছেন, নিজের ভাগ্যের উপর মানুষের ক্ষমতা সীমিত, আবার তার জীবন সম্পূর্ণরূপে পূর্বে-নির্ধারিতও নয়। বলাই বাহুল্য, ইবনে রুশদের এসব মন্তব্য বহু মুসলিম লেখকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়।

ইবনে রুশদ এ্যারিষ্টটলের উপর "জামি", "তালকিস" ও "তাফসীর" এ তিনটি বই লিখেন। পাঠক বা শিক্ষার্থীদের যোগ্যতানুসারে এ বইগুলো লেখা হয়েছিল। প্রথমটি ছিলো দর্শনের নভিস ছাত্রদের জন্যে, দ্বিতীয়টি মাধ্যমিক ও তৃতীয়টি উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে লেখা। শেষের বইটি ছিল সর্বাপেক্ষা বড়ো আকারের ও এতে কুরআন শরীফ থেকে বহু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে।

ইবনে রুশদ এর প্রভাব বিশেষ করে ইউরোপে স্থায়ীভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রফেসার বামেট তাঁর লেখা, "মুসলিম কনট্রিভিউশন টু সিভিলাইজেশন" পুস্তকে বলেছেনঃ "সেন্ট থমাস এ্যাকুইনাস ছিলেন মহান ব্যাখ্যাদাতার (ইবনে রুশদকে পশ্চিমে 'দ্যা গ্রেট কমেন্টেটর' বলে আখ্যায়িত করা হতো) প্রথম শিষ্য। আলবার্ট আলাগনাস ইবনে সিনহার কাছে ঋণী ছিলেন, এবং থমাস এ্যাকুইনাস প্রায় সম্পূর্ণরূপে ইবনে রুশদ এর নিকট ঋণী আছেন। এটা জোর করেই বলা যায় যে, মুসলিম দার্শনিক বিশেষ করে ইবনে রুশদ এর প্রভাব সর্বপ্রধান ক্যাথলিক ধর্ম-সংস্কারকদের উপর প্রতিফলিত হয়েছিল।"

ইবনে রুশদ দ্বাদশ শতাব্দির সর্বাপেক্ষা প্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর প্রভাব দ্বাদশ থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দি পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তাঁর বইগুলো কয়েক শত বছর যাবৎ ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক যুগে পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ও জনপ্রিয়তার পূর্ব পর্যন্ত ইবনে রুশদ এর লেখার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হতো। ১৮৩১ সাল পর্যন্ত মেক্সিকোর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইবনে রুশদ এর উপর গবেষণা হয়েছে।

নূরুদ্দিন ইবনে ইসহাক আল-বিরতুজী (মৃত্যুঃ ১২০৪ খ্রিঃ)

আল-বিরতুজীর জন্ম হয় মরোক্কোয়। পরে তিনি স্পেনের সেভিলে চলে আসেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করেন। তাঁর জন্মের তারিখ ঠিক জানা যায়নি, তবে ১২০৪ সনে সেভিলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আল-বিরতুজী তখনকার দিনের একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দিতে তাঁর লেখা পুস্তক, "কিতাব আল-হায়া" ইউরোপে জনপ্রিয় ছিল। বইটি প্রথমে হিবরু ভাষায় অনুবাদ হয় এবং পরে লেটিনে ভাষান্তরিত হয়। এ পুস্তকে আল-বিরতুজী টলেমীর সৌরজগৎ সম্পর্কিত তথ্যকে সংস্কার করতে চেষ্টা করেন কিন্তু, এ্যারিষ্টটলের গ্রহগুলোর প্রদক্ষিণ পথ নির্ভুল বৃত্তাকার বলে তিনি বিশ্বাস করেন। এর ফলে তাঁর থিওরী পরবর্তীতে গ্রহণযোগ্য হয়নি। সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহগুলোর প্রদক্ষিণ পথ যে বাস্তবে ডিম্বাকৃতি (এলিপটিক্যাল), তা নিকোলাস কোপারনিকাস নামে একজন পোলিস (পোল্যান্ডের) বিজ্ঞানী চতুর্দশ শতাব্দিতে প্রমাণ করেন। তবে আল-বিরতুজীর সময়েই অন্যান্য মুসলমান বিজ্ঞানীগণ এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছিলেন।

সৌরজগৎ নিয়ে লেখা আল-বিরতুজীর এ পুস্তকে বর্ণিত তথ্যাবলী যদিও নির্ভুল ছিল না, তথাপি তাঁর অবদান বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে বলা যায়। আল-বিরতুজী প্রমুখ মুসলিম বিজ্ঞানী যদি এসব চর্চা অব্যাহত রাখতেন না তবে বিজ্ঞানের ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লেখা হতো। আল-বিরতুজীর অবদানকে তাই মানব স্মৃতিতে সংরক্ষিত করার লক্ষ্যে ১৮৩৭ সালে চন্দ্রের উপর স্থাপিত ২৬ মাইল ব্যাস পরিমিত একটি আগ্নেয়গিরির মুখের (ক্রেটার) নামকরণ করা হয়,"আলপেট্রাজিয়াস" [ইউরোপে আল-বিরতুজী এ নামেই পরিচিত]।

ইবনে খালদুন (১৩৩২ - ১৩৯৫ খ্রিঃ)

সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস শাস্ত্রের জনক নামে খ্যাত সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম চিন্তাবিদ ইবনে খালদুনের পূর্ণ নাম হলো, আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ। তবে ইবনে

খালদুন নামেই তিনি বেশী পরিচিত। ৭৩২ হিজরীতে (১৩৩২ ইং সনে) তিউনিস (তিউনিসিয়া) শহরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পরিবার স্পেনের সেভিল থেকে এখানে এসেছিলেন। অষ্টম শতাব্দিতে তাঁর পূর্বপুরুষরা ইয়েমন থেকে স্পেনে আগমণ করেন। তাঁর জীবনের প্রাথমিক বছরগুলোতে নিজ সভ্রান্ত পরিবারের আধিক্য তিউনিস শহরে (তিউনিসিয়া), কিরূপ প্রভাবশালী ছিল তা তিনি অবলোকন করেন। উত্তর আফিকা ও স্পেনের মুসলিম শাসক ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের আগমন হতো তাঁদের পারিবারিক বাড়িতে। অনেকে আশ্রিত হয়েও আসতো। এদের সান্নিধ্যের প্রভাব স্বভাবতই ইবনে খালদুনের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল।

ইবনে খালদুন তিউনিস ও ফেজ নামক স্থানে লেখাপড়া করেন। তিনি কুরআন ও হাদীসের উপর গভীর জ্ঞানার্জন করেন। মালিকী মাজহাবে ফিকহ ও শরীয়তের উপরও তিনি অধ্যয়ন করেন। আরবি সাহিত্য, দর্শন, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপরও তাঁর জ্ঞান ছিলো। কৈশোরেই ইবনে খালদুন মিশরের শাসনকর্তা সুলতান বারকুখ এর দরবারে চাকুরী গ্রহণ করেন।

রাজনীতিতে অনেকদিন সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার পর, শেষ পর্যন্ত ইবনে খালদুন তাঁর ইতিহাসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, "মুক্বাদ্দিমা" বা "প্রবর্তন" রচনার কাজে হাত দেন। তিনি মরোক্কোর তিউনিস ও ফেজ শহরে, মুসলিম স্পেনের গ্রেনাডায় এবং উত্তর আফ্রিকার বায়াজা শহরে কাজ করেন। উত্তর আফ্রিকার রাজনীতিক গোলযোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ১৩৭৫ সালে ইবনে খালদুন গ্রেনাডায় চলে আসেন। কিন্তু অতীত জীবনে রাজনীতির সাথে জড়িত থাকায় এখানকার সুলতান তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেন।

এরপর তিনি আলজেরিয়ার ক্বালাত ইবনে সালামা নামে একটি ছোট্ট গ্রামে প্রায় আত্মগোপন করে, চার বছর কাটান। আর এখানেই তিনি মুক্বাদ্দিমা রচনা করেন। এ ইতিহাসের পুস্তকের কারণেই ইবনে খালদুন চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ইবনে খালদুনের জীবনে তখনও শান্তি ফিরে আসেনি। কারণ, উত্তর আফ্রিকা আবার রাজনীতিক গোলযোগে সরগরম হয়ে ওঠে। তাই ইবনে খালদুন এখান থেকেও পালিয়ে গেলেন, এবং শেষ পর্যন্ত মিশরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। এখানে আসার পর ইবনে খালদুনের সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। কিছুদিনের

মধ্যেই তিনি বিচারক হিসেবে আদালতে কর্মরত হলেন ও একই সময় প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় আল-আযহার-এ লেকচারার হিসেবে যোগ দিলেন।

ইবনে খালদুনের লেখা মুক্বাদ্দিমা গ্রন্থটি হচ্ছে, ইতিহাস ও সামাজবিজ্ঞানের দর্শনের উপর একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ পুস্তকের বিষয়স্তুর ফোকাস হচ্ছে, মানবেতিহাসের অগ্রগতির ধারায় মনন, অর্থনীতি, পারিপার্শ্বিক এবং সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভরশীলতার প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করা। ইবনে খালদুনের পূর্বে কেউই এসব সত্য উদঘাটন করতে পারেন নি। তাঁর মতে ইতিহাস ও সভ্যতা এসব বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল। তিনি মানব সভ্যতার উত্তান-পত্তন নিয়ে গবেষণা করে, এর কারণ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেন।

ইবনে খালদুনের এ নতুন আকর্ষণীয় সমাজবিজ্ঞানের চিন্তাদ্বারা মুসলমান ও পশ্চিমা শিক্ষিত সমাজে সাড়া জাগায়। ইবনে খালদুন ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে কয়েকটি ব্যাপারে আলোচনা করেন, যেমনঃ (১) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘনটা কিরূপ হয়ে থাকে, (২) অতীত ও বর্তমান নিয়ে গবেষণা, (৩) পারিপার্শ্বিক প্রভাবের গুরুত্ব ও (৪) মানুষের জীবনে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আর্থিক অবস্থা কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে প্রভৃতি।

ইতিহাস অধ্যয়নের সঠিক পন্থা ইবনে খালদুনই আবিষ্কার করেছেন। মানবসভ্যতার উপর ধারাবাহিক অধ্যয়নের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করার একটি সুন্দর উপায় তিনি বলে গেছেন। সভ্যতার শুরু, অগ্রগতির কারণ ও উহার পতন কেন হয়, প্রভৃতি ইবনে খালদুন পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং তিনি একটি নতুন বিজ্ঞানের জন্ম দেন, যাকে আজ আমরা সোসিয়োলোজি বা সমাজবিজ্ঞান বলি।

ইতিহাসের দার্শনিক স্বরূপ ব্যক্ত করতে যেয়ে ইবনে খালদুন বলেন, এটা হলো কার্যকারণ ও প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভরশীল। তাঁর এ মতামতের কারণে অনেকে তাঁকে ধর্মজ্ঞানের বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের মতে তিনি যুক্তিবাদের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। আসলে ইবনে খালদুনের উপর তাঁদের এ ধারণা ভিত্তিহীন। এর কারণ হলো, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তিহীনতার উপর ভিত্তি করে শিক্ষা হয়ে থাকে, তথাপি এটা ইসলামের ক্ষেত্রে মোটেই

প্রযোজ্য একটি শিক্ষাব্যবস্থা নয়। ইসলাম মানুষকে যুক্তি, পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও চিন্তাভাবনার জন্যে তাগিদ দিয়েছে। অবিশ্বাসীদেরকে ইসলাম স্মরণ করে দেয় যে, তারা যুক্তির মাধ্যমে চিন্তা করে না। এ ব্যাপারে কুরআন মানুষকে শত শত আয়াত দ্বারা জগত, মানুষ, সমাজ প্রভৃতি নিয়ে সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করার কথা বলেছে। বস্তুতঃ প্রভুকে জানতে ও চিনতে পারার উপায়ই হচ্ছে চিন্তা-গবেষণা। ইবনে খালদুন ধর্মবিরোধী মন্তব্য পেশ করেছেন বলে যে গুজব উঠে তা ছিলো, মূলত হিংসাপরায়ণ কিছু অ-মুসলিমদের অপ-তৎপতরতা। আসলে তাঁর চিন্তাদ্বারা কুরআন-হাদীসের আলোকেই পরিস্ফূটিত হয়েছিলো।

ইবনে খালদুন বলেন, মানব সভ্যতার সত্যিকার অগ্রগতি হয় সঠিক ইতিহাসের জ্ঞান থেকে। এ জ্ঞানার্জনে ইতিহাসবিদদের কিছু মৌলিক উপায় অবলম্বন করতে হবে, যথাঃ- তাঁদেরকে শুধুমাত্র শাসক, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দেশ সৃষ্টি ও ধ্বংস এবং সৈন্য সামন্তের ইতিহাস লিখলেই হবে না। সত্যিকার ইতিহাসে যাবতীয় আর্থ-সামাজিক অবস্থার বর্ণনাসহ সাধারণ মানুষের কথাও থাকতে হবে। সর্বোপরি ইতিহাস লেখকদেরকে সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হতে হবে। ইতিহাস বিকৃতির মত জঘণ্য অপকর্ম সামাজিক জীবনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে। ইতিহাস একটি স্থায়ী স্তম্ভের মতো, যা থেকে মানবজাতি ভবিষ্যৎ জীবনে উন্নতিসাধন করতে উপদেশ গ্রহণ করে। সুতরাং বিকৃত ইতিহাস মানুষের দিকনির্দেশনাকে ভ্রষ্ট করে দিতে পারে। রাজনৈতিক, সামাজিক বা আর্থিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্যেশ্যে যাঁরা ইতিহাস লিখে তাঁরা মানবতার সর্বাপেক্ষা বড় দুশমন। ইবনে খালদুন অত্যন্ত জোরালোভাবে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন।

ইবনে খালদুনের জীবদ্দশায়ই মুক্বাদ্দিমা গ্রন্থটির গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। তবে তাঁর লেখা এটাই একমাত্র প্রসিদ্ধ পুস্তক নয়। তিনি আরোও বহু পুস্তকের প্রণেতা ছিলেন। এর মধ্যে ইতিহাসের উপর লেখা "কিতাব আল-ইবার" সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এতে আরবদের ইতিহাস, সমকালীন মুসলমান ও ইউরোপিয়ান শাসকবর্গ, আরব, ইহুদি, রোম ও পারস্যের প্রাচীন ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, মিশরের ইতিহাস এবং উত্তর আফিকার ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়। ইবনে খালদুন, "আত-তাসরীফ" নামে আত্মজীবনীমূলক একটি বই প্রকাশ করেন। এ পুস্তকটির ফলে আত্মজীবনী লেখার প্রচলনও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। গণিত শাস্ত্রের উপরও

তাঁর একটি বই প্রকাশ হয়েছিল। ১৩৯৫ সালে এ মহান মুসলিম জ্ঞান-সাধকের মৃত্যু হয়।

মুহাম্মদ তারগাই উলুগ বেগ (১৩৯৩ - ১৪৪৯ খ্রি:)

উলুগ বেগ ছিলেন তুর্কীস্তানের সুলতান তিমুর (পশ্চিমে যাকে তামেরলেইন বলা হয়)-এর নাতী। উলুগ বেগ পঞ্চদশ শতাব্দির একজন প্রসিদ্ধ মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গাণিতিক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল শাহ রুখ, যিনি তিমুর বংশের একজন বাদশাহ ছিলেন। সেন্ট্রাল এশিয়ার সুলতানিয়া নামক স্থানে ১৩৯৩ সালে উলুগ বেগের জন্ম হয়। মুসলিম সভ্যতার একটি প্রসিদ্ধ নগরী সমরকন্দ। এ শহরের খ্যাতি উলুগ বেগ-এর প্রচেষ্টায়ই অর্জিত হয়েছিল। তিনি এখানে ১৪২৪ সালে একটি উচ্চ পর্যায়ের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। এ শিক্ষাকেন্দ্রে ইসলামী লেখাপড়া ছাড়াও বিজ্ঞান শাস্ত্রের উপর শিক্ষা দেওয়া হতো। বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্য এটা প্রসিদ্ধ ছিল।

এরপর ১৪২৮ সালে উলুগ বেগ সমরকন্দে তিন তলাবিশিষ্ট একটি জাঁকজমকপূর্ণ অবজারভেটরী (মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র) তৈরীর কাজে হাত দেন। এ অবজারভেটরীটি সুবৃহৎ ছিলো- যার ব্যস ছিল ২০০ ফুট চওড়া, আর উচ্চতা ১২০ ফুট। আলী কুদসী নামে একজন মুসলমান বিজ্ঞানীকে এ অবজারভেটরীর ডাইরেক্টর করা হয়। আল-কাশী ও খাদিজাদাসহ বেশ কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এ অবজারভেটরীতে গবেষণা করেন।

উলুগ বেগ তখনকার দিনে প্রাপ্য উত্তম জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি এ অবজারভেটরীতে সংগ্রহ করেছিলেন। ১৪৩৭ সালে উলুগ বেগ "ঝিদযী যাদীদ সুলতানী" নামে একটি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ করেন। এ পুস্তকে তিনি আকাশের তারকাগুলোর একটি ক্যাটালগ (তালিকা) তৈরী করেন, যা ছিল তারকাদের উপর সুদূর প্রসারী উন্নতমানের একটি ক্যাটালগ। এতে তারাদের নাম, অবস্থান ও উজ্জ্বলতার মান (মেগনিচিউড) প্রভৃতি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়। উলুগ বেগের এ ক্যাটালগটি ১৯১৭ সালে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে।

উলুগ বেগ বৎসরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিন ৫ ঘা ৪৯ মিনিট ১৫ সেকেন্ড বলেন, যা ছিল অত্যন্ত সঠিক। এছাড়াও তিনি গ্রহগুলোর প্রদক্ষিণ গতিপথের উপর তালিকা তৈরী করেন। এগুলো জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। চারটি উজ্জ্বল গ্রহঃ বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি প্রভৃতির মহাশূণ্যে বাৎসরিক ভ্রমণ সম্বন্ধে উলুগ বেগ গবেষণা করেন। তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যাবলী আজো গ্রহণযোগ্য বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন।

১৪৩৭ সালে তিনি আরেকটি তারার ক্যাটালগ তৈরী করেন। এ নতুন ক্যাটালগে সর্বমোট ৯৯২টি তারার অবস্থান ও উজ্জ্বলতার মাত্রা সন্নিবেশিত হয়। একজন সুদক্ষ গাণিতিক হিসেবে তিনি সাইন ও কো-সাইন (গণিতের ট্রিগোনোমেট্রির শাখা) টেবিল সৃষ্টি করেন। এটি আটটা ডেসিমেল পয়েন্ট পর্যন্ত সঠিক ছিল।

তিন বৎসর তুর্কীস্থানের শাসক হিসেবে থাকার পর, ১৪৪৯ সালে উলুগ বেগ এক আততায়ীর হাতে নিহত হন। এ দুঃজনক ঘটনার পর সমরকন্দের অবজারভেটরীর গুরুত্ব হারিয়ে যায়। পরবর্তীতে এ ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ১৯০৮ সালে রাশিয়ার প্রত্নতত্ত্ববিদরা এটির অবস্থান নির্ণয় করেন। বলাই বাহুল্য ইউরোপে ব্যাপক বিজ্ঞান চর্চা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম বিজ্ঞানের ইতিহাসে উলুগ বেগের নামই সবশেষে আসে। তাঁকে হত্যা করে যেন ইসলামের বৈজ্ঞানিক যুগকেই হত্যা করা হলো। তাঁর পর থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত আর কোন সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম বিজ্ঞানীদের নাম খুঁজে পাই না। পশ্চিমা বিজ্ঞানের চরম চেতনা যেন মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ও গবেষণাকে তখন থেকে একরূপ প্যারালাইজড্ করে ফেলল।

"মহান তিনি, (যিনি) আকাশে তারকামণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, এবং তাতে প্রদিপ্ত সূর্য ও উজ্জ্বল চন্দ্র স্থাপন করেছেন। যারা গ্রহণ করতে চায় অভিজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতা তাদের জন্য দিন ও রাতকে পরস্পর পশ্চাদগামী (করে) সৃজন করেছেন। রাহমানের (আল্লাহর) দাস তারা, যারা পৃথিবীতে বিচরণ করে (আল্লাহর) শুকরিয়া আদায় করে" [সূরা ফুরক্বান ঃ ৬১-৬৪]।

পরিচ্ছেদ- ৩

মুসলিম স্পেনে বিজ্ঞানচর্চা

মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞানচর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিয়ে আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি কিভাবে অনেক মুসলিম বিজ্ঞানী দীর্ঘ ৮০০ বছরব্যাপী বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করে পৃথিবীকে উপহার দিয়ে গেছেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক বিরাট ভাণ্ডার। তবে বিজ্ঞানের উপর এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় মুসলিম স্পেন একটি আলাদা পরিচ্ছেদের দাবী রাখে। এর দু'টি কারণ বিদ্যমান। একটি হলো, মুসলিম স্পেনে বিজ্ঞানচর্চা ছিলো ব্যাপক ও অপরটি হচ্ছে স্পেনের উন্নত মুসলিম সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে পশ্চিম ইউরোপ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত হয়েছিল। আসলে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান পশ্চিমে মুসলিম স্পেনের মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং ইউরোপীয় রেঁনেসার জন্ম যে পুরো মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফলাফল ও বিশেষকরে আন্দালুচিয়া বা মুসলিম স্পেনের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল, তা পাঠকদেরকে সম্যক জ্ঞাত করতে যেয়ে এ আলাদা পরিচ্ছেদের অবতারণা।

ঐতিহাসিক সত্য

ইসলামী সভ্যতা ছিলো সার্বিকভাবে কিতাবী জ্ঞানের সুফল। অর্থাৎ কুরআন-হাদীস ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর গবেষণা দ্বারা যে সুফল বেরিয়ে এসেছিল তা সমাজে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় এক উন্নততর সমাজব্যবস্থা। এরূপ উন্নত সভ্যতা ইতোমধ্যে ধরার বুকে কেউ দেখে নি। মুসলিম বুদ্ধিভিত্তিক

পরিমণ্ডলে তাই কিতাব বা গ্রন্থাদি ছিল সর্বাপেক্ষা মূল্যবান জিনিস। প্রমাণস্বরূপ আমরা নিম্নে বর্ণিত ঐতিহাসিক কিছু তথ্যাদি তুলে ধরতে পারি।

নবম শতকে ইউরোপে সেন্ট-গোল এর 'দ্যা লাইব্রেরী অব মনাস্টারী' ছিলো সর্ববৃহৎ পাঠাগার। এতে গ্রন্থের সংখ্যা ছিল মোট ৩৬টি ভলিয়ম! একই সময় কুর্দোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিষয়ে গন্থের সংখ্যা ৫ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। তবে শুধু কিতাবই যে আন্দালুসিয়ান মুসলিম সভ্যতার উল্লেখযোগ্য উপাদান ছিলো তা কিন্তু মোটেই নয়। ইসলামী সভ্যতার মূলে যে জিনিসটি মূখ্য ছিলো এবং আজো আছে তাহলো, পরমতসহিষ্ণুতা। অন্য কালচার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি সর্বদাই ইসলাম শ্রদ্ধার দৃষ্টি দিয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই, গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অসংখ্য গ্রন্থাদি মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতে এসে শুধু সংরক্ষিত হয় নি, এগুলো উন্নততর হয়েছে। মুসলমানরা যদি এ কাজটি আঞ্জাম না দিতেন তাহলে গ্রীকসহ পুরনো সভ্যতার অনেক কিছুই হারিয়ে যেত-সেসাথে তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং গবেষণার সুফল থেকেও পৃথিবীর মানুষ বঞ্চিত থাকতো- একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মুসলিম জ্ঞানচর্চার সাক্ষর বহন করছে আজকে প্রাপ্ত প্রায় ২,৫০,০০০ পাণ্ডুলিপি, যা প্রাচ্য ও প্রতিচীর বিভিন্ন লাইব্রেরী ও ব্যক্তিগত কালেকশনে রক্ষিত আছে। এ থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে, হয়তো আরোও লক্ষাধিক বই-পুস্তকের খবর আমরা জানি না। এগুলো কালের স্রোতে বিলীন হয়ে গেছে- এসাথে হারিয়ে গেছে কত অজানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা ও তথ্যাদি। সুতরাং বাস্তব কথা হলো, ৮০০ বছরের মুসলিম বিজ্ঞানচর্চার সিংহভাগই আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এগুলো থাকলে বিজ্ঞানের ইতিহাস অবশ্যই অন্যরকম লিখতে হতো। যা হউক, বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে স্পেনের আন্দালুসিয়ায় মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বরূপ কত ব্যাপক ছিল তার চিত্র এখন সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরছি।

ইতিহাসের পাতা থেকে

মধ্যযুগীয় স্পেনিশ খ্রিস্টানদের মধ্যে একটি কিংবদন্তী ছিল। ভিসিগথদের শেষ রাজা রডেরিক মুসলমানদের কর্তৃক আইবেরিয়ান উপদ্বীপ দখল হওয়ার জন্য দায়ী ছিলেন। এর কারণ হিসেবে তারা বলতো, রাজা নিজের ওয়াদা রক্ষা করতে ব্যর্থ

হয়েছিলেন। আর এ ওয়াদা ছিল ‘একটি যাদুকরী রাজপ্রাসাদ’ এর গেইট তিনি কোনদিন খুলবেন না। অথচ তিনি তা খুলে ফেলেন।

যা হউক, পশ্চিমা জগতের জন্য মুসলমানদের কর্তৃক স্পেন দখল অবশ্যই একটি বিরাট নিয়ামত ছিল। মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের ‘যাদুকরী প্রাসাদের’ তোরণ খুলে যেয়ে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ আলোকিত ইতিহাসে পদার্পন করে। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর কুখ্যাত ভেণ্ডেলস্, হান্স ও ভিসিগথরা পুরো আইবেরিয়ান উপদ্বীপে হত্যাযজ্ঞসহ ধ্বংসলীলা ঘটায়। তারা সবকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নিঃশেষ করে। তারা প্রতিষ্ঠিত করে একটি রাজ্য যা মূলত লুটতরাজের উপর চলতো। তারপর স্পেনের সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচন হলো। মুসলিম আরবরা ৭১১ খ্রিস্টাব্দে স্পেন দখল করলেন। এখানে স্থায়ীভাবে তাদের নিবাস গড়ে তুললেন।

প্রাথমিক যুগে আন্দালুসিয়া উমাইয়্যা খিলাফতের শাসনাধীন থেকে ধাপে ধাপে উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হয়। এরপর আব্বাসীদের কাছে বাগদাদে খিলাফত হারিয়ে যাওয়ার পর উমাইয়্যারা স্পেনে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমতঃ তারা কুর্দোভা শহরে গড়ে তুলেন মুসলিম স্পেনের শিক্ষাকেন্দ্র। আব্বাসী খিলাফতকালীন সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ ও স্কলাররা কুর্দোভায় এসে তাঁদের জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে থাকেন। এ থেকে কালে কুর্দোভা আন্দালুসিয়ার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি শহরে পরিণত হয়, যেখানে উন্নত একটি সতেচন, শিক্ষিত সমাজ গড়ে ওঠে।

ইসলামী সভ্যতা ছিলো একটি বুদ্ধিবৃত্তিক, জ্ঞানচর্চানির্ভর কৃষ্টি। এর মূলে ছিলো বই-পুস্তরের প্রতি অত্যধিক কদর- যা আরও সতেজ ও গতিশীল হয়ে ওঠে যখন ৭৫১ সালে চীনে কাগজ আবিস্কৃত হয়ে মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কাগজের সদ্যবহার এমন ব্যাপকভাবে শুরু হলো যে, ইতোমধ্যে এরূপ জ্ঞানচর্চা ইতিহাসে কখনও দেখা যায় নি। রোম ও লেটিন পশ্চিমে বই-পুস্তক প্রাপ্তি তখনও ছিলো অনেক কঠিন ও মূল্যসাপেক্ষ। কিন্তু মুসলিম বিশ্বে গ্রন্থাদি হয়ে ওঠে সবার প্রাপ্য ও অপেক্ষাকৃত সস্তা। বাস্তবে, মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হলেও, অনেকদিন যাবৎ পশ্চিমে এই কাগজের ব্যবহার শুরু হয় নি। এর ফলে দামী চামড়ার (পার্চমেন্ট) মধ্যে লিখিত বই-পুস্তক শুধুমাত্র ধনাঢ্যদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, দ্বাদশ শতাব্দিতে কোন এক

ব্যক্তি 'বুক অব আওয়ারস্' নামক একখানা গ্রন্থ ক্রয় করতে যেয়ে ১২০ একর জমি বিক্রি করেছিলেন!

বাস্তবে পশ্চিম ইউরোপ ও প্রাচ্যের মধ্যে সভ্যতা ও কৃষ্টিগত পার্থক্য ব্যাপক হওয়ার একটি প্রধান কারণই ছিলো এই কাগজের ব্যবহার। মুসলিম বিশ্বসহ সমগ্র প্রাচ্য যখন ব্যাপক হারে কাগজের ব্যবহার করছিলো, ঠিক তখন পশ্চিমা জগৎ তা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। এর ফলে তাদের সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার ঘটতে বিলম্ব হয়। তবে আন্দালুচিয়াসহ পুরো মুসলিম বিশ্বে শুধুমাত্র কাগজের ব্যবহারের ফলে জ্ঞানচর্চার প্রতিটি ফিল্ডে ইতিহাসের চরম উন্নয়ন ঘটেছিল তা বলা মোটেই বাস্তবসম্মত হবে না। কুর্দোভার রাজপ্রাসাদে (আল-হামরাহ) মুসলিম / অমুসলিম সবাইকে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সমভাবে স্বাগত জানানো হতো। ইহুদি-খ্রিস্টানরা খোলামেলাভাবে মুসলমানদের সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে পারতেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় একদা এক উচ্চপদস্থ পাদ্রী এই বলে অভিযোগ তুলেন যে, 'খ্রিস্টান নতুন প্রজন্ম আরবি ভাষা শিখতে খুব বেশী আগ্রহশীল হয়ে পড়েছে। অথচ তাদের উচিত, লেটিন ভাষা শিক্ষা করা।' পাদ্রীর এই অভিযোগ থেকে এটাই অনুমিত হয় যে, তখনকার দিনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা হয়ে ওঠে আরবি- যা আজকের দিনে এসে ইংরেজি হয়ে গেছে।

আন্দালুচিয়ায় মুসলিম জ্ঞানচর্চা

আন্দালুচিয়ান সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলে নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি হয় যখন আব্দুর রহমান ২য়, কুর্দোভার শাসক নিযুক্ত হন। জ্ঞানচর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রেই শুরু হয় এক অবিশ্বাস্য বিপ্লব। মুসলিম- ও স্বল্পসংখ্যক ননমুসলিমসহ সবাই এই বিল্পবে সামীল হয়ে আন্দালুচিয়া তথা কুর্দোভা শহরকে ইউরোপের আলোতে রূপান্তরিত করেন। এই আলোর ঔজ্জ্বল্য সমগ্র পশ্চিম ইউরোপকে দান করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূর্যালোক সদৃশ রৌশনী- যা থেকে জন্ম নেয় ইউরোপীয় রেঁনেসা।

আব্দুর রহমান ২য়, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কালচারেল প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন বাগদাদের সঙ্গে। আন্দালুচিয়াকে এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী করতে তিনি যথাসম্ভব চেষ্টা চালান। চিন্তাশীল মনীষী ও জ্ঞান-বিজ্ঞানীদের তিনি হায়ার করে নিয়ে আসেন।

জ্ঞানচর্চার বদলে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। আব্দুর রহমানের এই ওফার বিফলে যায় নি। প্রাচ্যের অনেক প্রসিদ্ধ স্কলার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর গবেষকরা মুসলিম স্পেনে হিজরত করেন। এর ফলে আন্দালুচিয়ায় গড়ে ওঠে সুদূরপ্রসারী একটি ইন্টেলেকচুয়াল কালচার- যা পরবর্তী ৪০০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

আব্দুর রহমানের প্রচেষ্টার সুফল অন্যান্য ক্ষেত্রেও স্বায়ী প্রভাব ফেলে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগামী মুসলিম স্পেনের সর্বত্র অচীরেই গড়ে ওঠে অসংখ্য লাইব্রেরী, মসজিদ, হাসপাতাল, গবেষণা প্রতিষ্ঠন ইত্যাদি। এতে প্রাচ্যের প্রসিদ্ধ স্কলাররাও ঝাঁকে ঝাঁকে স্পেনে এসে হাজির হন। এদের আগমনের ফলে প্রাচ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী সুদূর আন্দালুচিয়া পাড়ি জমায় প্রসিদ্ধ প্রফেসরদের নিকট থেকে শিক্ষাগ্রহণ করার আশায়। সে যুগে প্রসিদ্ধ কোন শিক্ষকের সুহবত ও তার কাছ থেকে শেখার আশায় বিশাল মুসলিম বিশ্বের দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শহরে গমনাগমন স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। বস্তুতঃ তখন মুসলিম বিশ্বে শিক্ষাগ্রহণের গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। শিক্ষার প্রতি সমাজের প্রত্যেকের মধ্যে ছিলো বিশেষ অনুরাগ- যা দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকের মুসলিম বিশ্বে তেমনটি দেখা যায় না।

আব্বাস ইবনে ফিরনাস (মৃঃ ৮৮৮ খ্রিঃ)

প্রসিদ্ধ শিক্ষকদের মধ্যে আব্বাস ইবনে ফিরনাসের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি যদি তখনকার মেডিসি অঞ্চলের 'ফ্লরেন্স' শহরের বাসিন্দা হতেন তাহলে তাকেই হয়তো 'রেঁনেসার জনক' বলে ইতিহাসের পাতায় ঘোষণা করা হতো। প্রাথমিক জীবনে তিনি সঙ্গীতের উপর গবেষণা করেন। কিন্তু কুর্দোভার ইন্টেলেকচ্যুয়াল আলো-বাতাস তাকে একটিমাত্র জ্ঞানচর্চায় আবদ্ধ রাখতে পারে নি। অচীরেই তিনি 'আকাশ ভ্রমণের' উপর উচ্চতর গবেষণা শুরু করেন। টেষ্ট ফ্লাইটের জন্য তিনি একটি মডেল তৈরী করেন। কাঠের নির্মিত এই মডেলে ছিলো দু'টি পাখা। তিনি এটা পরিচালনা করে আকাশে উড্ডয়নের চেষ্টা চালান। উল্লেখ্য, লিনার্দো ডাভিনসিও একটি উড়ো দেওয়ার 'মডেল' অঙ্কন করেছিলেন, কিন্তু তার জন্ম হয় ফিরনাসের ৬০০ বছর পরে।

ইবনে ফিরনাস ঐ কাঠের তৈরী মডেলে আরোহণ করে আকাশে উড়ো দেওয়ার টেষ্ট-ফ্লাইট করতে যেয়ে সামান্যের জন্য জীবন হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে তিনি উড়ো দেওয়ার স্বপ্নকে বাদ দিয়ে অন্য আরেকটি আবিষ্কারের প্রতি মনোযোগ দেন। তিনি একটি নভোথিয়েটার (প্লানেটারিয়াম) তৈরী করেন। এতে সেকালে জানা প্রতিটি গ্রহের মডেল বানিয়ে [কক্ষপথে যেভাবে চলে সেভাবে] চলন্ত রাখার ব্যবস্থা ছিল। কক্ষপথে গ্রহগুলোকে চলন্ত দেখাতে যেয়ে ইবনে ফিরনাস খুব জটিল ও উন্নতমানের 'গিয়ার' সিস্টেম আবিষ্কার করেন। এই নভোথিয়েটারে বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ চমকানোও নাটকীয়ভাবে প্রদর্শন করা হতো।

এরপর ইবনে ফিরনাস পদার্থবিদ্যার দিকে মনোযোগ দেন। তিনি ক্রিস্টেল (স্ফটিক) এর গাণিতিক ব্যাখ্যার উপর গবেষণা করেন। এছাড়া কৃত্রিম উপায়ে ক্রিস্টেল তৈরীর একটি গাণিতিক সমীকরণ আবিষ্কার করেন।

ইবনে ফিরনাসের গবেষণা ও আবিষ্কার সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি সৌভাগ্যক্রমে। কারণ ১৫০০ সালে খ্রিস্টান স্পেনিশ পাদ্রীরা মুরিশ (মুসলিম স্পেনিশ) কৃষ্টি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য গ্রন্থসহ ১০ লক্ষাধিক বই-পুস্তক পুড়িয়ে ফেলে। ইতিহাসবিদ কারমেন এই তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। এরপরও যেসব আবরী ভাষার বৈজ্ঞানিক পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে সেগুলো পুরোপুরিভাবে আজও অধ্যয়ন ও গবেষণা করা হয় নি। নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে এগুলো যখন পুরোপুরিভাবে স্ট্যাডি করা হবে তখন আমরা মুসলিম বিজ্ঞানচর্চার আরও বহু চিত্তাকর্ষক বিষয়াদি জানতে পারবো।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর গবেষণা

আন্দালুচিয়ায় ব্যাপকভাবে নেচারেল সাইন্স বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর গবেষণা হয়েছে। তবে এটা স্বীকার করতে হয়, প্রাচ্যের বিজ্ঞানীদের মতো মৌলিক অবদান তারা তেমন বেশী রাখতে সক্ষম হন নি। কিন্তু যাকিছুই তারা অবদান রেখেছিলেন তা পরবর্তীতে অত্যন্ত বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল- বিশেষ করে ইউরোপে। কারণ, আন্দালুচিয়ার গবেষকদের দ্বারাই সমগ্র ইউরোপ আলোকিত

হয়েছিল। মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুফল থেকে উপকৃত হয়ে উন্নত সভ্যতার গৌরবে ভূষিত হয়েছিল।

বাগদাদের খলীফা আল-মামুনের 'বাইতুল হিকমাহ' বা জ্ঞানের কক্ষের মতো আন্দালুচিয়ায় তেমন কোন জ্ঞানকক্ষ ছিলো না। কিন্তু সেখান থেকে যখন অসংখ্য কিতাব কুর্দোভায় এসে পৌঁছলু তখন স্থানীয় গবেষকরা নেচারেল সাইন্সের উপর আগ্রহী হয়ে উঠলেন। সুতরাং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর একাধিক গবেষক শুরু করলেন গবেষণা যার ফলাফল পশ্চিম ইউরোপ উপভোগ করেছে।

অপরদিকে অঙ্ক শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মেডিসিনে আন্দালুচিয়ানদের গভীর আগ্রহ তো সব সময়ই ছিল। এসব বিষয়ের প্রেকটিক্যাল ব্যবহারও তখন ছিল ব্যাপক। অঙ্ক ছাড়া ইসলামী ফরায়েজ (উত্তরাধিকার) আইনের প্রয়োগ অসম্ভব। এছাড়া যাকাত নির্ণয়, জমির মাপ, ওজন, দূরত্ব নির্ণয় ইত্যাদি দৈনন্দিন অসংখ্য ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের বিকল্প নেই। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যবহার দ্বারা নামাযের সময়সূচী তৈরী, সমুদ্রপথে চলার জন্য তারকার অবস্থান নির্ণয়, ক্যালেণ্ডার তৈরী ইত্যাদি আঞ্জাম দেওয়া হতো। মেডিসিন যে কতো উপকারী ছিলো তা আর বলার উপেক্ষা রাখে না। সুতরাং এসব বিষয়ের উপর গবেষণা শুধু অনুসন্ধিৎসু মনে খোরাক যোগানো ছিলো না- এ থেকে গবেষক বৈষয়িক দিক থেকে উপকৃতও হতেন। এসব ছিলো লাভজনক গবেষণা।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। বৈজ্ঞানিক কোন সত্য কখনও দীন ইসলামের আক্বীদা বিরোধী হতে পারে না। তবে এ সময় কিছু অমুসলিম সূত্র থেকে অ-বৈজ্ঞানিক দু'টি বিষয় বিজ্ঞানের ছত্রছায়ায় গবেষণার মেইনস্ট্রীম জ্ঞানচর্চায় 'ঢুকে' পড়ে। এগুলো হলো আষ্ট্রলজী ও আল-কেমী।

অনেকের ধারণা আষ্ট্রলজী বা জ্যোতিষশাস্ত্র এসেছে গ্রীক সভ্যতা থেকে। তবে ভারতবর্ষেও এর উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর আল-কেমী শব্দটি যেহেতু আরবি ভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ত তাই এটাকে মুসলমানদের 'বিজ্ঞান' বলা হয়। কিন্তু আসলে মোটেই তা নয়। আল-কেমী শব্দটি আরবি তা সঠিক। কিন্তু আল-কেমীর উদ্দেশ্য কিন্তু অনেক পুরাতন। সাধারণ কোন ধাতুকে স্বর্ণ কিংবা অন্য কোন মূল্যবান ধাতুতে রূপান্তরিত করার চেষ্টাকেই বলে 'আল-

কেমী'। যা হোক, এ দু'টি বিষয় যে অ-বৈজ্ঞানিক বিষয়াদি এ ব্যাপারে ইউরোপের অনেক আগে মুসলিম বিজ্ঞানীরা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

'জ্যোতির্বিজ্ঞান' ও 'জ্যোতিষশাস্ত্র' যে একই বিষয় নয় এবং 'কেমিষ্ট্রি' আর 'আল-কেমী' যে দু'টি আলাদা সাবজেক্ট এ ব্যাপারে আন্দালুচিয়ার একজন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী সোচ্চার ছিলেন। ইবনে হাজম নামক এই বিজ্ঞানী একাদশ শতকে এই ব্যাপারটি বিজ্ঞানমহলে অবহিত করেন। অথচ ইউরোপীয় রেঁনেসা সংঘটিত হওয়ার শতাধিক বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও পশ্চিমা জগৎ বিষয়টি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। ইবনে হাজম একজন বিজ্ঞানী হিসেবে 'ম্যাজিক', 'আল-কেমী' ও 'আষ্ট্রলোজি'র ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি এগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় বক্তব্য প্রদান করতেন। যারা এসব বিষয় সত্য বলে সমাজে প্রচার করতো তিনি তাদেরকে 'নির্লজ্জ মিথ্যুক' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

অঙ্ক ও জ্যোতির্বিদ্যা

অঙ্ক ও জ্যোতির্বিদ্যার উপর গবেষণা স্পেনেও হয়েছে। বিশেষ করে আল-খোওয়ারিজমীর প্রখ্যাত কিতাব 'দ্যা কালকুলেশন অব ইন্টেগ্রেশন এণ্ড ইক্যুয়েশন' যখন আন্দালুচিয়ায় পৌঁছল, তখন থেকে এটিই পরবর্তী অনেক গবেষণার মৌলিক সূত্রে পরিণত হয়। খোওয়ারিজমী এই বইটিতে বীজগণিতের সমীকরণ, পুরণ ও ভাগ অঙ্ক এবং বস্তুর উপরিভাগের ক্ষেত্রফল নির্ণয়সহ অন্যান্য বিষয়ের উপর গাণিতিক গবেষণা করেন। খোওয়ারিজমীই সর্বপ্রথম ভারতে আবিস্কৃত তথাকথিত 'আরবি নাম্বার' সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ও পাশ্চাত্য জগতে ছড়িয়ে দেন। শূন্যসহ (০) ১ থেকে ৯ পর্যন্ত 'সাংকেতিক' নাম্বার সিস্টেম না থাকলে পুরো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অকেজো হয়ে পড়তো। খোওয়ারিজমির পূর্বে রোমান অক্ষর দ্বারা নাম্বার লেখা হতো। কিন্তু অক্ষর দ্বারা অঙ্ক কষা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তাছাড়া শূন্যের ব্যবহার ছিলোই না! সুতরাং ভারত থেকে ধার করে হলেও- খোওয়ারিজমী আরবি নাম্বার সিস্টেম জগতকে শিখিয়ে বিরাট অবদান রেখে গেছেন- যা মানুষ যুগ যুগ ধরে কৃতজ্ঞতাসহ স্মরণ রাখবে।

খোওয়ারিজমীর বই ও জ্যামিতির উপর লিখিত ইউক্লিডের আরবিতে ভাষান্তরিত প্রখ্যাত গ্রন্থ 'ইলেমেন্ট' হয়ে ওঠে সে যুগের গণিতশাস্ত্রের মূল সূত্র। এ দু'টি

বইয়ের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী শত শত বছর যাবৎ বিজ্ঞানীরা গণিতের উপর গবেষণা করে গেছেন। আন্দালুচিয়ায়ও এর ব্যতিক্রম ছিলো না।

আন্দালুচিয়ার প্রথম গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন মাসলামা ইবনে মাজরিতি। তিনি দশম শতাব্দির দিকে জীবিত ছিলেন। তবে তার শতাধিক বছর আগেও জীবিত ভেলেন্সিয়ার ইবনে উবাইদা নামক এক বিজ্ঞানী সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি। তিনি সে যুগের নেতৃস্থানীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। উবাইদা ছিলেন বহিরাগত। তার জন্মস্থান ছিলো বাগদাদ।

ইবনে মাজরিতি কিন্তু উচ্চপর্যায়ের গবেষক ছিলেন। তিনি অঙ্ক ও জ্যোতির্বিদ্যার উপর একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া টলেমীর 'আলমাজেস্ট' এর উপর গবেষণা ও কমেন্টারী লিখেন। তিনি খোওয়ারিজমীর আস্ট্রনোমিক্যাল টেবিলের বর্ধিতকরণ ও সংশোধন করেন। তিনি ফার্সী ও হিজরী ক্যালেণ্ডারের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে একটি টেবিল তৈরী করেন। যা থেকে পারস্য ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর সঠিক তারিখ নির্ণয় সম্ভব হয়।

পশ্চিমে যাকে আরজাকেল নামে ডাকা হয়, সেই প্রখ্যাত গাণিতিক আল-জারকালীও কুর্দোভা শহরের অনেক নক্ষত্রের মধ্যে একটি নাম। তিনি একাদশ শতাব্দিতে জীবিত ছিলেন। তিনি থিওরিটিক্যাল জ্ঞান ও প্রযৌক্তিক দক্ষতার মধ্যে সম্পর্কবিধান সৃষ্টি করেন। এছাড়া তিনি অনেক নতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবক ছিলেন। পানি চালিত তার তৈরী ঘড়ি থেকে দিন-রাতের ঘণ্টার হিসেব ছাড়াও চান্দ্রমাসের ক্যালেণ্ডারের সঠিক তথ্য জানা যেতো। প্রখ্যাত 'টলেডান টেবিল্‌স'-এ তার অবদান ছিল অপরিসীম। এই তালিকার মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যার সঠিক তথ্যাদি সন্বিবেশিত হয়েছিল। মহাকাশে তারাগুলোর নাম, অবস্থান, ঔজ্জ্বল্যতা, গতিপথ ইত্যাদি এই টেবিল থেকে জানা যেতো। আল-জারকালী 'আলমানেক' এর জন্য নিজে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। আলমানেক শব্দের অর্থ হলো আবহাওয়া। তার গ্রন্থ থেকে কপ্টিক, রোমান, চান্দ্র ও পারস্য ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী কোন্‌ তারিখে মাস, বছর ইত্যাদি শুরু হয় তা জানা যেতো। এছাড়া বইটি থেকে গ্রহগুলোর অবস্থান যে কোনো বিশেষ সময়ে ঠিক কোথায় হবে তা বের করা যেতো। আরও তথ্যাদি ছিল যা থেকে ভবিষ্যতে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সঠিক তারিখ ও সময় নির্ধারধ সম্ভব হতো। তিনি লেটিচিউড ও লঙ্গিচিউডের

উপরও তথ্যপূর্ণ লেখালেখি করেন। তার অনেক বই-পুস্তক পরবর্তীতে স্পেনিস ও লেটিন ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

আল-বিরতুজী ছিলেন আন্দালুচিয়ার আরেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। ইউরোপে তিনি আলপেট্রোগিয়াস নামে পরিচিতি। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর 'বুক অব ফর্ম' নামক একখানা বই লিখেন। এতে গ্রহ-উপগ্রহসহ মহাকাশের তারকাগুলোর গতিবিধি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে।

অঙ্ক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর উপর্যুক্ত গবেষণাসমূহ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত অনেক শব্দাবলী আজও দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো আরবি থেকে ধারকরা। এখানে রাশিচক্রের কয়েকটি নাম উল্লেখ করা যায়, যেমনঃ 'আকরাব' [আরবি- 'আ'ক্বরাব' থেকে যার অর্থ 'বিচ্ছু'], 'আলটেয়ার' [আরবি শব্দ আল-ত্বা'ইর থেকে যার অর্থ 'উড়া'], 'ডেনেব' [আরবি 'যান্‌ব' থেকে যার অর্থ 'লেজ'] এবং 'ফেরকার্ড' [আরবি শব্দ 'ফারখুদ' থেকে যার অর্থ 'বাচ্চা']। এছাড়া অনেক আরবি শব্দ আছে যা আজকাল ইংরেজিসহ ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় সচরাচর ব্যবহৃত হচ্ছে [দেখুন, পরিশিষ্ট - ৪]। এ থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম স্বর্ণযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ইলমী পরিমণ্ডলে মুসলমানরা কতো এডভান্স ছিলেন।

মেডিসিন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে মৌলিক অবদান

মেডিসিনে মুসলমানদের অবদান ছিলো সর্বাপেক্ষা বেশী। এ বিষয়ের উপর আন্দালুচিয়ায় ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। বাস্তবে এই বিষয়ের উপর মুসলিম জ্ঞান তাপসদের আগ্রহ প্রাথমিক যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। পবিত্র কুরআন শরীফে মৌমাছি কর্তৃক জমাকৃত মধুকে মানুষের উপকারী বলা হয়েছে। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক রোগের প্রতিকার আছে'। এ ব্যাপারে আরও অনেক হাদীস শরীফ লিপিবদ্ধ হয়েছে [দেখুন পরিশিষ্ট - ৬]। সুতরাং রোগ-ব্যাধী থেকে বাঁচার ও আরোগ্য লাভের স্বাভাবিক প্রবণতা ও এসাথে কুরআন ও হাদীস শরীফ থেকে উৎসাহপ্রদান গবেষকদের আগ্রহকে শতগুণ বৃদ্ধি করে।

ইসলামপূর্ব যুগেও ঔষধবিজ্ঞানের উপর গবেষণা হয়েছে। তবে রোগমুক্তির উপায়-উপকরণের মধ্যে তখনকার দিনে বিভিন্ন ম্যাকিজ ফর্মুলা ও অন্ধবিশ্বাস জড়িত ছিলো। বাস্তবে মুসলমানদের হাতে এসে ঔষধের উপর গবেষণা সত্যিকার অর্থে 'বৈজ্ঞানিক' বিষয়ে রূপলাভ করে। মেডিসিন যে একটি উচ্চপর্যায়ের বিজ্ঞান ও এর উপর দীর্ঘকাল লেখাপড়াসহ ট্রেনিংয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে- এসব ব্যাপার গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে। সুতরাং ডাক্তারী পেশাকে গ্রহণযোগ্য করতে যেয়ে গড়ে ওঠে জটিল 'রুল্স অব কন্ডাক্ট'।

শুধুমাত্র ডাক্তারী লেখাপড়া করেই কেউ ডাক্তার হিসেবে কর্মক্ষেত্রে যোগ দিতে পারতো না। তাকে অবশ্যই কিছু নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী বা এগুলো অর্জন করতে হতো। ইবনে হাজম বলেন, একজন ডাক্তারকে অবশ্যই- সদয়, সহমর্মিতাপূর্ণ, বন্ধুসুলভ, ভালো, গালি-গালাজ শ্রবণ করেও ধৈর্যশীল, কঠোর সমালোচনা সহ্য করার ক্ষমতা ইত্যাদি গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে। এছাড়া নিজেকে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা- যেমন, মাথার চুল খাটো করে কাটা ও অতিরিক্ত নখ কেটে ফেলা; তাকে অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাদা কাপড় পরিধান এবং নরম-দিলা হতে হবে; তার কথাবার্তায় থাকতে হবে ভদ্রতা ও মাধুর্য ইত্যাদি।

প্রত্যেক ডাক্তারকে প্রেকটিস শুরুর আগে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর উপর একটি বিশেষ পরীক্ষা নিতে হতো। পাশ করার পর তাকে কছম খেয়ে কর্মক্ষেত্রে যোগ দিতে হতো। প্রেকটিস করাকালে সঠিক 'কোডকরা' চাল-চলনে কোন হেরফের ধরা পড়লে সাথে সাথে তাকে বহিষ্কার করা হতো।

সরকারী হাসপাতালগুলোতেও অনুরূপ কড়া পরিচালনা-ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল যাতে, রোগীদের চিকিৎসা, সুযোগ-সুবিধা ও অগ্রাধিকারে কোন ত্রুটি না ঘটে। কুর্দোভা শহরে একটি বৃহৎ হাসপাতাল ছিল। এটা আধুনিক হাসপাতালের তুলনায় কোন ক্ষেত্রেই অনুন্নত ছিলো না। এতে টাবের পানি, বাথরুম, বিভিন্ন রোগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ডিপার্টমেন্ট বা সেকশন ছিল। প্রত্যেক সেকশনে একেকজন স্পেশালিস্ট ডাক্তার ছিলেন। প্রত্যেক হাসপাতাল ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকতো। জরুরী বিভাগে আগত রোগীদেরকে বিনা চিকিৎসায় কখনো ফিরিয়ে দেওয়া হতো না। এককথায়, উন্নতমানের চিকিৎসাব্যবস্থা সে যুগে সর্বপ্রথম

মুসলমানদের দ্বারাই শুরু হয়। আর আন্দালুচিয়ার কুর্দোভাসহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।

মুসলিম ডাক্তাররা মেডিকেল বিজ্ঞানের উপর অসংখ্য মৌলিক অবদান রাখেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রখ্যাত ডাক্তার ইবনে নাফিস এর কথা এখানে তুলে ধরা যায়। তিনিই সর্বপ্রথম দেহের মধ্যে রক্তের সার্কুলেশন নিয়ে মৌলিক গবেষণা করেন। এছাড়া সংক্রামক রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে যেয়ে যে ক্যুয়ারানটিন [রোগীদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে রাখা- যাতে রোগজীবাণূ বিস্তারলাভ করতে না পারে] ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, তার উদ্ভাবকও ছিলেন ইবনে নাফিস।

কুর্দোভার আরেক প্রসিদ্ধ ডাক্তারের নাম ছিল ইবনে জুলজুল। তিনি ৯৪৩ সালে কুর্দোভায় জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি নেতৃস্থানীয় একজন চিকিৎসক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি মেডিসিনের উপর ১৪ বছর বয়সে লেখাপড়া শুরু করেছিলেন। ইবনে জুলজুল গ্রীক চিকিৎসক ডায়োসকোরাইডিস এর ‘ডি মেটেরিয়া মেডিকা’র উপর একটি কমেন্টারী বা মন্তব্য লিখেন। এছাড়া আন্দালুচিয়ায় প্রাপ্ত ঔষধ-পত্রের উপরও তার লিখিত একখানা বই পাওয়া যায়। উমাইয়্যা এক রাজপুত্রের অনুরোধে তিনি ‘ক্যাটাগোরিজ অব ফিজিশিয়ান্স’ নামক আরও একখানা ইতিহাসের বই লিখেন। এতে গ্রীক ডাক্তার এ্যাসকোলাপিয়াস থেকে তার সময় পর্যন্ত মেডিক্যাল বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে।

দশম শতকে আন্দালুচিয়ায় অনেক ডাক্তার কর্মরত ছিলেন। এদের কেউ কেউ বাগদাদ গিয়ে প্রাকটিস করেছেন। এরা সে যুগের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী তাবিত ইবনে কুররা ও তাবিত ইবনে সিনান এর সান্নিধ্য লাভ করেন। আন্দালুচিয়ায় এসব ডাক্তার প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে মদীনাতুয যাহরা নামক স্পেনিশ শহরের সরকারী কেয়ার্টারে নিয়ে আসা হয়। এদের একজনের নাম ছিল আহমদ ইবনে হারান। তাকে সরকারী ডিসপেনসারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। এখান থেকে গরীব রোগীদেরকে বিনামূল্যে ঔষধপত্র ও খাদ্য প্রদান করা হতো।

ইবনে শুহায়িদ নামক এক ডাক্তার ঔষধব্যবহারের উপর একখানা কিতাব রচনা করেন। সে যুগের অধিকাংশ ডাক্তারদের মতো তিনিও মত প্রকাশ করেন যে, খাদ্যদ্রব্য সঠিকভাবে রোগীকে পরিবেশনের পরও যদি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ

না হয়, তবেই কৃত্রিম ঔষধ সেবন উচিৎ হবে। অর্থাৎ নেচারেল উপায়ে রোগ থেকে আরোগ্যলাভ উত্তম। ঔষধ ব্যবহার হতে হবে শেষ চেষ্টা। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সে যুগেও ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ডাক্তাররা ওয়াকিবহাল ছিলেন। ইবনে শুহায়িদ আরও বলেছেন, একমাত্র সিরিয়াস কেইছ ছাড়া গোগীদেরকে সাধারণ ঔষধ সেবন করানো উচিৎ।

আন্দালুচিয়ার সর্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন জাহরাবী। পশ্চিমে তিনি 'আলবুকাসিস' নামে খ্যাত। ১০১৩ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। জাহরাবী সম্পর্কে ইতোমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি। এখানে আন্দালুচিয়ার উপর অতিরিক্ত এই পরিচ্ছেদে তার নাম উল্লেখ না করলে পুরো লেখাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তার প্রসিদ্ধ কিতাবের নাম ছিল 'তাছরিফ'। লেটিন ভাষায় ভাষান্তরিত হওয়ার পর মধ্যযুগে এই গ্রন্থটি, মেডিসিনের মহামূল্যবান একটি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে সমগ্র ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শত শত বছর যাবৎ পঠিত হয়েছে। সার্জারী বা অস্ত্রোপচারের উপর লিখিত খণ্ডে জাহরাবী যন্ত্রপাতির একাধিক নক্সা অঙ্কন করে দেখিয়েছেন। এছাড়া সার্জারীর বিভিন্ন পন্থা যেমন হাত-পা কাটা [এ্যামপুটেশন], চক্ষুতে অপারেশন ও পেটের মধ্যে অস্ত্রোপচার ইত্যাদি বিষয় সুস্পষ্টভাবে তাছরিফে বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা মেডিসিনের উপর ইতোমধ্যে এমন গভীর তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ আন্দালুচিয়ার আর কেউ প্রকাশ করেন নি।

ইবনে জোহর [পশ্চিমে 'আভেনজোর' নামে প্রসিদ্ধ] ১১৬২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ইতোমধ্যে এ খণ্ডে আমাদের সঙ্গে তার পরিচিতি ঘটেছে। তিনি সেভিল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ও স্পেনে তার খ্যাতি ছিল বিরাট। তিনি টিউমার বলতে আমরা এখন যা বুঝি তার আবিষ্কারক ছিলেন। এছাড়া থেরাপিউটিক্স বা রোগ নিরাময় বিদ্যার উপর তিনি মৌলিক অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তার লিখিত প্রসিদ্ধ একটি বই ছিলো, 'তাইসির'। ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে বইটি লেটিনে অনুদিত হওয়ার পর পশ্চিম ইউরোপে মেডিসিনের একটি স্ট্যান্ডার্ড গ্রন্থ হিসেবে তা স্বীকৃত হয়।

মেডিসিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি বিজ্ঞান হচ্ছে উদ্ভিদ বিজ্ঞান। অসংখ্য বৃক্ষ-তরু-লতার মধ্যে যে ঔষধী গুণাগুণ বিদ্যমান তা অনেক আগে থেকেই মানুষ জানতো। মুসলিম উদ্ভিদবিদরা এ বিষয়ের উপর ব্যাপক গবেষণা করেছেন।

আন্দালুচিয়ার জগতখ্যাত উদ্ভিদবিদ ইবনে বাইতার এ বিষয়ের উপর একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটির ইংরেজি নাম হচ্ছে 'কালেকশন অব সিম্পল ড্রাগ্স এণ্ড ফুড'। গ্রন্থে তিনি বর্ণানুক্রমিকভাবে বিভিন্ন ঔষধী উদ্ভিদের গুণাগুণ তুলে ধরেন। এসব বৃক্ষরাজির প্রায় সবগুলোই তখনকার দিনে স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় পাওয়া যেতো। তিনি এসব বৃক্ষরাজি সংগ্রহে সারা জীবন কাটিয়েছিলেন। প্রত্যেক বৃক্ষের উপর তিনি আলাদাভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। এর মধ্যে ছিল, কিভাবে ঔষধ তৈরী করতে হবে এবং তা সেবনের নিয়ম-কানুন।

আন্দালুচিয়ান চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে আরও একজন প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন যার নাম এখানে উল্লেখ না করলে পুরো ব্যাপারটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তার নাম ছিল ইবনে খাতিব। তিনি শুধু চিকিৎসক ছিলেন তাই নয়- একজন ইতিহাসবিদ, কবি ও রাজনীতিবিদ হিসেবেও তার সুনাম ছিল। রোগজীবাণূ সংস্পর্শের মাধ্যমে কিভাবে একজন থেকে অপরজনের মধ্যে বিস্তারলাভ করে সে ব্যাপারে তিনি মৌলিক থিওরী উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, "ইনফেকেশন এর ব্যাপারটি একজন তদন্তকারীর নিকট পরিষ্কার হয়ে ওঠে যখন সে কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে থেকে নিজে রোগাক্রান্ত হয়। অথচ যে ব্যক্তি এই সংস্পর্শ থেকে মুক্ত সে রোগ থেকেও রেহাই পায়। এছাড়া রোগজীবাণূ কাপড়-ছোপড়, পান ও খাবার পাত্র এবং কানের দোলনার মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।"

ইবনে খাতিবই ছিলেন স্পেনে সর্বশেষ মুসলিম মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। তার মৃত্যুর পরই শুরু হয় খ্রিস্টানদের কর্তৃক আইবেরিয়ান উপদ্বীপ পুনর্দখলের সংগ্রাম।

ভূগোল শাস্ত্রের উপর স্পেনিশ মুসলমানদের অবদান

ভূগোলের উপর মুসলমানদের অবদান ছিলো ব্যাপক। আর এ বিষয়ের উপর অনেক উন্নত গবেষণা এই আন্দালুচিয়ায়ই হয়েছিল। যদিও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ এই ফিল্ডে ব্যাপক স্ট্যাডির বিশেষ উপকরণ ছিলো, তথাপি মুসলিম বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধিৎসু মনও যে সবাইকে গবেষণায় আগ্রহশীল করে তুলেছিল সে কথাও দৃঢ়ভাবে বলা যায়। কারণ, পৃথিবী নিয়ে গবেষণার ইশারা-

ইঙ্গিত তো মহান ঐশীগ্রন্থ কুরআন শরীফেই একাধিক আয়াতে দেওয়া হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রগতি মুসলিম স্বর্ণযুগে হওয়ার কারণ হিসেবে যদি বলা হয়, তা সবই ছিল বৈষয়িক উন্নয়ন সাধনে কিংবা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলে- তবে তা মারাত্মক ভুল হবে। জানার জন্য জানা, মনের পিপাসা মেটাতে জ্ঞানচর্চা- মুসলিম বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই এই জানার স্পৃহা হেতু গবেষণা করে জীবন কাটিয়েছেন। এদের অনেকে বিখ্যাত হলেও সবাই বিরাট ধনী হয়েছেন- একথা কেউ প্রমাণসহ বলতে পারবেন না।

যা হোক, ভূগোলের উপর প্রাথমিক গবেষণা মুসলিম প্রাচ্যেই শুরু হয়েছিল। আব্বাসী খলীফাদের পিয়নদের জন্য একাধিক 'তরীকার বই' [রাস্তার বই] প্রকাশিত হয়। এরপর শীঘ্রই দূর-দূরান্তের শহরের ম্যাপ ও সেখানকার পণ্য, বাণিজ্য ইত্যাদি তথ্যাদিসহ কিতাবাদি প্রকাশিত হতে থাকে। একই সময় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রের উপর অগ্রগতি হওয়ায় ম্যাপ অঙ্কন অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই ম্যাপ অঙ্কনের বিদ্যা 'কারটোগ্রাফী' [মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যা] একটি আলাদা প্রফেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ভূগোলের উপর আন্দালুচিয়ার গবেষকদের মধ্যে যারা প্রসিদ্ধ ছিলেন তারা হচ্ছেন ইবনে মুহাম্মদ আল-রাজী [ইউরোপে রাজেজ]: তিনি ৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আন্দালুচিয়ার ভূগোলের উপর বই-পুস্তক লিখেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল-ওয়ারাক্ব: তিনি রাজীর সমকালীন ছিলেন। তিনিও আন্দালুচিয়া ও আফ্রিকার ভূগোলের উপর গুরুত্বপূর্ণ বই-পুস্তক রচনা করেন। তিনি আফ্রিকার টপোগ্রাফীর [প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ] উপর তার বইয়ে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

ইব্রাহীম ইবনে ইয়াকুব: তিনি নবব শতকের শেষের দিকে পুরো ইউরোপ ও বলকানে ভ্রমণ করেন। এই বীরপুরুষ তার ভ্রমণকাহিনী ম্যাপসহ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাকে বীরপুরুষ বলার কারণ হলো, তখনকার দিনে খ্রিস্টানশাসিত দেশে একজন মুসলমানের জন্য ভ্রমণ করা সত্যিই সাহসী কাজ ছিল।

আল-বাকরী: তিনি সোলটেজ নামক স্থনে ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। একজন সফল স্কলার হিসেবে প্রসিদ্ধ এই গবেষক ইতিহাস, কবিতা, সাহিত্যের উপর গবেষণা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং ভূগোলের উপর একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। আরব উপদ্বীপের ভূগোলের উপর তার লেখা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গেছে। পুস্তক দু'টিতে লেখক বর্ণানুক্রমিকভাবে শহর, গ্রাম, উপত্যকা, পাহাড়-পর্বত ও দর্শনীয় ল্যান্ডমার্কগুলোর পরিচিতি তুলে ধরেন। তার অপর প্রসিদ্ধ রচনা আংশিকভাবে রক্ষিত হয়েছে। এটা ছিলো একটি বিশ্বকোষ। আল-বাকরী এতে গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তথ্যাদি বর্ণনার তার নিজস্ব একটি নিয়ম ছিল। যে কোন দেশের পরিচিতি তুলে ধরতে গিয়ে তিনি নাগরিকদের পরিচিতি, তাদের ধর্ম-কৃষ্টি-ইতিহাস, দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, রাজধানীসহ প্রসিদ্ধ সকল শহরের পরিচিতি ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে প্রথমে বর্ণনা করেছেন। এরপর অন্যান্য বিষয় লিখেছেন। যে কোন শহরের পরিচিতি তুলে ধরতে যেয়েও তিনি একই নিয়ম ব্যবহার করেছেন। এর ফলে বিশ্বকোষটি সবার কাছে সহজে বুঝা ও পাঠযোগ্য হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা তার বর্ণিত 'গ্যালিচিয়া' নামক একটি শহরের কথা তুলে ধরতে পারি। তিনি এই শহরের বাসিন্দাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন: "তারা বিশ্বাসঘাতক, অপরিষ্কার এবং বছরে মাত্র এক বা দু'বার গোসল করে- তা-ও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে। তারা কখনও তাদের গায়ের কাপড় ছিড়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধৌত করে না কারণ তারা মনে করে, কাপড়ে ধূলো-বালি ও ময়লা জমা হয় ঘর্মের কারণে আর এতে শরীর থাকে নরম।"

আল-ইদ্রিসী: মুসলিম স্পেনের সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত ভৌগোলিক ছিলেন এই জ্ঞানতাপস। ১১০০ খ্রিস্টাব্দে কুর্দোভা শহরে ইদ্রিসীর জন্ম হয়। তাঁর সম্পর্কে অবশ্য ইতোমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি। এখানে অতিরিক্ত যা বলার তা হলো, এই মুসলিম ভৌগোলিক স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, আনাতোলিয়া ইত্যাদি অঞ্চল ভ্রমণ শেষে বর্তমান ইতালীর সিসিলি শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তার খ্যাতী তখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। স্থানীয় নরম্যান রাজা রজার ২য় তাকে পুরো পৃথিবীর সংবিধিবদ্ধ আপ-টু-ডেইট উন্নতমানের একটি ভূগোলের গ্রন্থ রচনার দায়িত্ব দেন। এই গ্রন্থটির নাম ছিল, 'দ্যা বুক অব রজার'।

আল-ইদ্রিসী এই গ্রন্থে তখনকার দিনে জানা যাবতীয় ভৌগোলিক তথ্য সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেন। তবে এই গ্রন্থে তার বর্ণিত এক মুসলিম নাবিকের ঘটনা হলো সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। তিনি লিখেছেন, মরক্কোর এক সমুদ্রপথের নাবিক তার জাহাজ নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে হারিয়ে যান। দীর্ঘ দিন ভ্রমণশেষে স্বদেশে ফিরে এসে রিপোর্ট করেন, তিনি একটি অপরিচিত সবুজে ঘেরা দেশে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানকার মানুষ সকলেই ছিলো উলঙ্গ ও ভয়ানক। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, আল-ইদ্রিসী কর্তৃক লিপিবদ্ধ এই নাবিক যে দেশের বর্ণনা দিয়েছেন তা ছিল উত্তর কিংবা দক্ষিণ আমেরিকা। কারণ, সেসময় উভয় মহাদেশের উলঙ্গ বাসিন্দারা ছিলো রেড-ইণ্ডিয়ান জাতি। [এ নামটি এসেছে কলম্বাসের এক্সপিডিশন থেকে। তিনি ভেবেছিলেন ভারতবর্ষে বুঝি পৌঁছেছেন- তাই উলঙ্গ লালচে বর্ণের নেটিভদেরকে তিনি রেড-ইণ্ডিয়ান বলে সম্বোধন করেন। 'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ' নামকরণের পেছনেও অনুরূপ কারণ নিহিত। কলম্বাস মনে করেছিলেন পশ্চিম ভারতের একটি অজানা সমুদ্র সৈকতে তিনি পৌঁছেছেন- যা এই ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল।] সুতরাং কলম্বাসের অনেক আগেই মুসলমানদের কর্তৃক আমেরিকা আবিস্কৃত হয়েছিল।

আন্দালুচিয়া দু'টি চিত্তাকর্ষক ও সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকাহিনীর লেখকদেরকেও জন্ম দিয়েছে। এ দু'টি ভ্রমণকাহিনী ইংরেজি ভাষায় অনুদিত হয়েছিল এবং এখনও প্রাপ্য আছে। এর প্রথমটির লেখক ছিলেন ইবনে জুবায়ের। তিনি গ্রেনাডা অঞ্চলের গভর্ণর ছিলেন। ১১৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইবনে জুবায়ের পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গিয়েছিলেন। এই ভ্রমণের উপর তিনি বইটি রচনা করেন যার নাম ছিলো, "সফর"। ডাইরী আকারে লিখিত এই পুস্তকে পূর্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের বর্ণনা পাওয়া যায়। তখন তোড়জুড়ে 'ক্রুসেড' চলছিল। লেখক বইটি পরিষ্কার প্রাণবন্ত ভাষায় রচনা করেন এবং এতে দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিসম্মন্ন মন্তব্য স্থান পায়।

ইবনে বতুতা: পৃথিবীবিখ্যাত এই ভ্রমণকারীও ছিলেন আন্দালুচিয়ান। তিনি উত্তর আফ্রিকা, সিরিয়া, মক্কা ও মদীনা শরীফ, ইরাক, ইয়েমন, এশিয়া মাইনোর, কৃষ্ণ সাগর অঞ্চল, লোহিত সাগর অঞ্চল, ক্রাইমিয়া, কন্সটান্টিনোপল, আফগানিস্তান, বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষ ও চীনসহ অনেক দেশে ভ্রমণ করেন। তার জীবনের

পৃথিবীবিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করে ৭৩ বছর বয়সে তিনি গ্রেনাডায় মৃত্যুবরণ করেন।

আন্দালুচিয়ান আরোও একাধিক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ও গবেষকদের কথা আমরা আগের পরিচ্ছেদসমূহে বর্ণনা করেছি। এদের মধ্যে ইতিহাসের জনক নামে খ্যাত ইবনে খালদুন, দার্শনিক ইবনে হাজম ও ইবনে রুশদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

মুসলিম স্পেনে প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও অভাবনীয় উন্নয়ন সাধিত হয়। স্পেনের মুসলিম ইঞ্জিনিয়ারদের কৃতিত্ব সম্পর্কে আজো তেমন গবেষণা হয় নি। তবে তাদের কৃতকর্মের স্থায়ী প্রভাব সমগ্র ইউরোপে প্রতিফলিত হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমরা আশা করবো প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মুসলিম স্পেনের কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ইতিহাসবিদ, লেখক ও গবেষকরা এগিয়ে আসবেন। আমাদের ধারণা মুসলিম স্বর্ণযুগে রচিত আরবি ভাষার হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি যেহেতু এখনও সুরক্ষিত আছে, তাই গবেষণায় অবশ্যই সুফল বেরিয়ে আসবে।

“মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবা-রাত্রির আবর্তনে রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন” [সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০]।

পরিচ্ছেদ - ৪

ইসলামী স্বর্ণযুগের পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি

ইসলামী বিজ্ঞানের চেতনা যখন মুসলিম জনপদে দিন দিন স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিলো ঠিক তখন লেটিন পশ্চিমে বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে এই জাগরণ অবশ্যই মুসলিম বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত। মুসলিম বিজ্ঞানীদের অকল্পনীয় বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি থেকেই সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ প্রভাবিত হয়। স্পেনের কুর্দোভা শহরে যে বৈজ্ঞানিক চরম উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছিলো তা থেকে সমগ্র ইউরোপব্যাপী একটি জাগরণ সৃষ্টি হয়।

ইউরোপের শিক্ষিতরা আরবি ভাষা শিখে বিজ্ঞানের বিভিন্ন আরবি গ্রন্থাদি লেটিনে ভাষান্তরিত করেন। এসব বই-পুস্তক ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে শত শত বছর ব্যবহৃত হয়। তখন সমগ্র ইউরোপব্যাপী একটি কথা সর্বজনস্বীকৃত হয়ে ওঠে, আর তাহলো, “জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য আরবি ভাষা শেখো”।

দর্শনের ক্ষেত্রে এ্যারিস্টটল, টলেমী, উইক্লিড, পিথাগোরাস ও প্লেটো এবং ইবনে সিনা, ইবনে ফারাবী, আল-কিন্দি, আল-গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইবনে রুশদ, ইবনে আরাবি, আল-ইদ্রীসি প্রমুখ জ্ঞানতাপসদের অনুসরণে গড়ে ওঠে নতুন জাগরণ। থমাস একুয়ইনাস দর্শন ও খ্রিস্টবাদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন। কার্যকারণ ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সম্পর্ক গড়তে তিনি ব্রত হন। তবে এই প্রচেষ্টা কট্টর খ্রিস্টবাদীদের আহত করে। থমাস একুয়ইনাসের মৃত্যুর কদিন পরে ১২৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের আর্চবিশপ (অর্থোডক্স চার্চের স্থানীয় প্রধান) একুয়ইনাস ও এ্যারিস্টটলের ২১৯টি প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তিনি

বলেন, এসব দর্শন ও বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবাবলী ধর্মের জন্য ক্ষতিকর। অন্যকথায় খ্রিস্টানদের বিজ্ঞানবিরোধী অবস্থান তখনও নিশ্চিহ্ন হয় নি।

উন্নতমানের গ্রীক ও ইসলামী বিজ্ঞানকে গ্রহণ করা বা না করা নিয়ে একদিকে খ্রিস্টবাদী ইউরোপে চলছিলো উচ্চ পর্যায়ের তিক্ত সংলাপ-সংঘাত আর অপরদিকে সমগ্র ইউরোপ দিন দিন মুসলিম জনপদ- বিশেষকরে তুর্কীস্থান ও স্পেন থেকে আগত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-পুস্তকে ছেয়ে যাচ্ছিলো। এ সময় প্রিন্টিং প্রেসের আবিষ্কার হওয়ায় এসব বই-পুস্তক সবার জন্য প্রাপ্তিসাধ্য হয়ে ওঠে। এরফলে পশ্চিমে সত্যিকার অর্থে একটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপ্লব শুরু হয়। এই বিপ্লবের ফলেই আধুনিক বিজ্ঞানের উত্তান ঘটে।

আধুনিক বিজ্ঞানের উত্তান

ইসলামী বিজ্ঞানচেতনার সত্যিকার সুফল হচ্ছে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান। তবে দুঃখের বিষয় হলো, এই ব্যাপক সম্প্রসারণ মুসলিম জনপদে না হয়ে তা হয় পশ্চিম ইউরোপে। ইউরোপের সর্বত্র মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারকে সম্বল করে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক চেতনা জাগ্রত হয়। ইতিহাসবিদরা এই জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে পোলিস জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপারনিকাসের [১৪৭৩-১৫৪৩] নাম সাব্যস্ত করেছেন।

১৫৪৩ সালে পোলিস এই জ্যোতির্বিজ্ঞানী সৌরজগতের উপর 'ডি রিভোলুশনিবাস অরবিয়াম কয়েলেসটিয়াম' নামক তাঁর প্রসিদ্ধ বইটি প্রকাশ করেন। তিনি মূলত টলেমির আলমাজেস্ট [এ নামটি পুস্তকের আরবি নামকরণ] বইটির উপর গবেষণা করে সৌরজগতের গতিবিধি সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য তুলে ধরেন। টলেমী বলেছিলেন, পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করছে এবং সূর্যসহ বাকী সব গ্রহ-উপগ্রহ পৃথিবীকেই প্রদক্ষিণ করে। এছাড়া তার মতে প্রদক্ষিণপথ হচ্ছে বৃত্তাকার। কিন্তু কোপারনিকাসও সূর্যকে কেন্দ্রে স্থির অবস্থায় থাকার কথা বলেন [যা অবশ্য সঠিক নয়- পরবর্তীতে দেখা গেছে সূর্যেরও গতি আছে, সে তার নিজের মধ্যশলাকার উপর ঘুরছে এবং সমগ্র সৌরজগৎ নিয়ে আমাদের গ্যালাক্সি মিল্কিওয়ের চতুর্দিকে হু-হু করে ঘূর্ণমান আছে। এ ব্যাপারে

দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।] এবং তিনি প্রদক্ষিণপথ বৃত্তাকার বলে গ্রহণ করেন [এটাও সঠিক ছিলো না- দ্বিতীয় খন্ডে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে]।

এছাড়া পৃথিবীসহ সকল গ্রহ-উপগ্রহের বার্ষিক ও আহ্নিক এই দু'টি গতি আছে বলে তিনি অঙ্কের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন। বলাই বাহুল্য কোপারনিকাসের এই সূর্যকেন্দ্রিক থিওরী হাজার বছরের পুরাতন পৃথিবীকেন্দ্রিক থিওরীকে ওলট-পালট করে দেয়। তার এই ধারণা থেকেই পৃথিবীও যে একটি গ্রহ তা পরিষ্কার হয়। কিন্তু কট্টর খ্রিস্টানদের নিকট এ নতুন থিওরী ছিলো কুটারাঘাতের মতো। তারা এর ব্যাপক বিরোধিতা শুরু করে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি যে, কোপারনিকাসের থিওরীর সিংহভাগ বিষয়বস্তু মুসলিম বিজ্ঞানীদের কাছে অজ্ঞাত ছিলো না। বাস্তবে কোপারনিকাস যে তাঁদের ধারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা একটি ঐতিহাসিক সত্য। উপরে বর্ণিত তার গ্রন্থে মুসলিম একাধিক বিজ্ঞানীর কথা তিনি কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতিস্বরূপ লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং কোপারনিকাসকে এককভাবে রেঁনেসার জন্মদাতা বলা মোটেই বাস্তবসম্মত হবে না। মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুফলই রেঁনেসার জন্য ডাইরেক্টলী দায়ী- তা আর অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। পশ্চিমা কিছু স্বার্থপর লেখক ইচ্ছে করেই ঐতিহাসিক এ সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা অতীতে চালিয়েছেন, যা সত্যিই দুঃখজনক।

কোপারনিকাসের এই বৈপ্লবিক থিওরীকে আরও উন্নতমানের করে তুলেন জোহান কেপলার [১৫৭১-১৬৩০]। ধার্মিক এই জ্যোতির্বিজ্ঞানী হলি রোমান সম্রাট রুডলফ-২য় এর ব্যক্তিগত গণিতবিদ ছিলেন। তিনি সৌরজগতের উপর তিনটি নতুন আইন উপস্থাপন করেন। এগুলো হলোঃ ১. সব গ্রহ একেকটি ডিম্বাকৃতি [এলিপটিক্যাল] প্রদক্ষিণপথে ঘূর্নমান আছে এবং সূর্য এই এলিপসের একটি ফোকাসে অবস্থান করে। ২. সূর্য থেকে যতো দূরে গ্রহ সরে যায় সে তুলনায় তার গতিও কমে। ৩. যে কোন দু'টি গ্রহের প্রদক্ষিণ করার সময়ের পরিমাণের গুণফল তাদের মধ্যকার সূর্য থেকে গড় দূরত্বের তিনগুণ ফল আনুপাতিক। বলাই বাহুল্য কোপারনিকাসের এইসব তথ্য বিশ্বতত্ত্বের উপর গবেষণায় বিরাট অগ্রগতি সাধন করে।

কোপারনিকাস আর কেপলারের পরে ইটালীর গ্যালিলিও গ্যালেলাই [১৫৬৪-১৬৪২] বিজ্ঞানের আরও উৎকর্ষ সাধন করেন। গ্যালিলিও কেপলারের থিওরীর মধ্যে দু'টি জরুরী তথ্য সংযোগ করেন। এগুলো হলো: সৌরজগতের গবেষণায় নতুন গতিবিজ্ঞানের ব্যবহার এবং মাহাকাশ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে আরও নতুন উপায়-অবলম্বনের উদ্ভাবন। এসময় হল্যান্ডে সর্বপ্রথম টেলিস্কোপ (দূরবীক্ষণযন্ত্র) আবিষ্কৃত হয়। গ্যালিলিও নিজে এই যন্ত্রটি কোনদিন স্বচক্ষে না দেখেই নিজে আরেকটি উন্নতমানের দূরবীক্ষণযন্ত্র তৈরী করেন। ১৬১০ সালে তাঁর পর্যবেক্ষণের ফলাফল 'দ্যা স্টারী মেসোর' নামক একটি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। গ্যালিলিও চন্দ্রের মধ্যে পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, শুষ্ক সাগর দেখতে পান। তিনি সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ জুপিটারের চারটি বড় উপগ্রহ (চন্দ্র) আবিষ্কার করেন। তিনি শনিগ্রহের রিং সিস্টেমও দেখতে পান। গ্যালিলিও সৌরজগতের এসব আবিষ্কার সম্পাদন করে একটি বিশ্বতত্ত্ব উপস্থাপন করতে ব্রত হোন এবং ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ "ডায়োলগ কনসার্নিং দ্যা টু চীফ ওয়ার্লড সিস্টেম্‌স" প্রকাশ করেন। এরপর ১৬৩৮ সালে প্রকাশ করেন তাঁর অপর বৈপ্লবিক গ্রন্থ "ডিসকোর্সেস এন্ড ডেমোস্ট্রেশন কনসার্নিং টু নিউ সাইন্সেস"।

গ্যালিলিও এসব গ্রন্থে স্বভাবের আইন-কানুন ও গাণিতিক পদ্ধতির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। গ্যালিলিওর এসব বৈপ্লবিক আবিষ্কার ও থিওরী কিন্তু প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টান রোমান ক্যাথলিক চার্চকে রাগান্বিত করে তুলে। কোপারনিকাসের থিওরীকে গ্রহণ করার ফলে তাঁকে শেষ জীবন ঘরবন্দী অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। চার্চ ১৬১৬ সালে কোপারনিকাসের সকল পুস্তক নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

গ্যালালিওকে নির্দেশ দেওয়া হয়: কোপারনিকাসের থিওরী প্রচার করবে না। এছাড়া এই থিওরী ভুল বলে স্বীকারোক্তি দিতে তাকে বাধ্য করা হয়। যারা ভাবেন বিজ্ঞান খ্রিস্টবাদের মাধ্যমে উৎকর্ষিত হয়েছে তারা আরেকবার ভাবুন। বাস্তবে অষ্টাদশ শতাব্দি পর্যন্ত কট্টর খ্রিস্টানরা বৈজ্ঞানিক চেতনার ঘোর বিরোধী ছিলো। আর এর প্রতিক্রিয়ায়ই শেষ পর্যন্ত ইউরোপে ধর্মবৈরিতার জন্ম হয়, প্রতিষ্ঠিত হয় তথাকথিত কট্টর যুক্তিবাদ বা রেশনালিজম।

এক্ষেত্রে ইসলামধর্ম স্বতন্ত্র। ইসলাম ও বিজ্ঞান এবং ক্ষেত্রবিশেষে দর্শন যুগ যুগব্যাপী সামঞ্জস্যতা বজায় রেখেছে। বাস্তবে কোনদিনই বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে

ইসলামের কোন সংঘাত ঘটেনি। আর যারা মনে করে এতে সংঘাত আছে তারা না আছে অবগত ইসলাম সম্পর্কে না আছে বিজ্ঞান সম্পর্কে। ধর্মকে মানবজীবনের কোন কোন দিক যেমন রাজনীতি ও বিজ্ঞান থেকে আলাদাকরণের প্রয়োজন দাঁড়িয়েছিল খ্রিস্টবাদের ক্ষেত্রে। ইসলামের ক্ষেত্রে এ প্রয়োজনীয়তা কখনও দেখা দেয়নি। অথচ আজ যারা এ প্রয়োজনীতা আছে বলে মনে করেন এরা বাস্তবে ইহুদি-খ্রিস্টবাদিতা ও তাদের প্রণিত ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের প্রভাবেই এরূপ কথা বলেন।

রাজনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি ইসলামের আওতাভুক্ত। ইসলামকে এসব বস্তু থেকে আলাদা করার কোন যুক্তিও নেই এবং প্রয়োজনও নেই। তাছাড়া এরূপ করার প্রয়াস ইসলামের জন্য এবং এই দীনে বিশ্বাসীদের জন্যও মারাত্মক ক্ষতিকর। আধুনিক সুধী-শিক্ষিত মুসলিম সমাজ এ সত্য যতো তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করবেন ততোই সবার জন্য মঙ্গলময়।

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগের সূচনা মুসলমানদের হাতেই হয়েছিল। সুতরাং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামের জ্ঞানের উপর বিজ্ঞ একটি মুসলিম সমাজ আজ সমগ্র বিশ্বের জন্য কল্যাণময় হবে। এ সত্যকে উপলব্ধি করে নতুন বিশ্ব-ওয়ার্ডার গড়ে তুলতে হবে।

গ্যালিলিওর মৃত্যুর কিছুদিন পর প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আইজাক নিউটনের [১৬৪৩-১৭২৭] জন্ম হয়। তিনি ১৬৮৭ সালে মেথেমেটিক্যাল প্রিন্সিপালস অব নেচারেল ফিলোসফি [সংক্ষেপে প্রন্সিপিয়া] নামক তাঁর জগতখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতে নিউটনের তিনটি প্রাকৃতিক গতির আইনের কথা তুলে ধরা হয়।

এগুলো হলোঃ ১. যে কোন বস্তু স্থির অথবা পরিবর্তনশীল সরলরেখায় চলমান গতির মধ্যে থাকে যদি না অপর কোন ফোর্স (শক্তি) একে অন্য অবস্থায় না ফেলে [এটাকে ইনার্শা (জড়তা) আইন বলে]। ২. যে কোন বস্তুর গতি পরিবর্তন এর উপর যে ফোর্স ক্রিয়াশীল আছে তার সঙ্গে আনুপাতিক (প্রপোরশন্যাল) এবং তা সে দিকে চলে যে দিকে ফোর্স বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল [এটাকে একসেলেরেশন (ত্বরণ) আইন বলে]। ৩. প্রত্যেক ক্রিয়ার সঙ্গে একটি বিপরিত এবং সমান প্রতিক্রিয়া নিহিত [এটাকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আইন বলে]। এই আইনগুলো

পৃথিবীর উপর সত্য বলে প্রমাণ করার পর নিউটন এগুলোকে সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের ক্ষেত্রেও সত্য বলে প্রমাণ করার প্রয়াস পান।

এরপর তিনি তার সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত মহাকর্ষ আইনটি প্রকাশ করেন। এতে বলা হয়েছে: জগতের প্রতিটি বস্তুই একে অন্যকে একটি ফোর্সের মাধ্যমে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণ শক্তি বস্তুগুলোর ওজনের গুণফলের সঙ্গে সরাসরি আনুপাতিক ও এই ফোর্স বিপরিতভাবে তাদের মধ্যে দূরত্বের গুণফলের সঙ্গে আনুপাতিক।

নিউটন শুধু গাণিতিক কিংবা জ্যোতির্বিজ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি একজন দক্ষ আলোকবিজ্ঞানীও ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম প্রিজম নামক কাঁচের যন্ত্রের মাধ্যমে সাধারণ সূর্যালোকে যে সাতটি রং আছে তা প্রমাণ করেন। এই সাতটি রংকে বিজ্ঞানের ভাষায় স্পেকট্রাম বলে। বিজ্ঞানজগতে নিউটনের প্রভাব অনস্বীকার্য। নিউটনের পর বিংশ শতাব্দির প্রারম্ভ পর্যন্ত তার ব্যাখ্যায়িত বিশ্বতত্ত্ব সমগ্র বৈজ্ঞানিক সমাজকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছিল। কিন্তু নিউটনেরও তথ্যাবলী নির্ভুল ছিলো না। একটু পরই এর প্রমাণ আমরা উপস্থাপন করবো।

"আল্লাহর আধিপত্য রয়েছে আসমান ও জমিনে এবং এতদুভয়ের মধ্যে সবকিছুতে; তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান" [সূরা আন্‌নিসা ঃ ১২০]।

পরিচ্ছেদ ৫

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দি

উনবিংশ শতকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও টেকনোজিক্যাল উন্নয়ন পশ্চিম ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রায় সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। যদিও শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে স্যার জগদিশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭ -উদ্ভিদ বিজ্ঞান), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪ -পদার্থবিজ্ঞান), পদার্থবিজ্ঞানে নবেল পুরস্কার লাভকারী চন্দ্রশেখর (১৯১০-১৯৯৫ -অ্যাস্ট্রফিজিক্স) এবং বিংশ শতকের শেষের দিকে প্রফেসর আবদুস সালাম (১৯২৬-১৯৯৫ -নিউক্লিয়ার ফিজিক্স) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা অনস্বীকার্য অবদান রেখেছিলেন। তবে বিজ্ঞানের সিংহভাগ অগ্রগতি মূলত পশ্চিমেই সাধিত হয়।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইমানুয়্যাল কান্ট [১৭২৪-১৮০৪], থমাস রাইট [১৭১১ -১৭৮৬] এবং লাপলেস [১৭৪৯-১৮২৭] প্রমুখ বুঝতে সক্ষম হন যে, বাইবেলে বর্ণিত বিশ্বের ৬ হাজার বছর বয়স মোটেই সঠিক হতে পারে না। বাস্তবে এই মহাবিশ্ব মিলিয়ন মিয়িলন বছর পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে। এই সত্য উদঘাটিত হওয়ার পর সমগ্র সৌরজগৎ নিয়ে গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন হয়ে পড়ে। পৃথিবীটাও যে একটি বিবর্তনের মাধ্যমে কোটি কোটি বছরে রদবদল হয়ে আসছে এ সত্যটিও বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা পড়ে। আর এটার জের ধরেই বৃটিশ ইহুদি প্রকৃতিবাদী চার্লস ডারইউন [১৮০৯-১৮৮২] তাঁর প্রখ্যাত বিবর্তনবাদের জন্ম দেন। এই থিওরীটি কিন্তু এখনও বিতর্কিত। অনেক বিজ্ঞানী আছেন যারা এতে বিশ্বাস করেন না। তবে এ থিওরী মিথ্যা বলে অনেকের ধারণা থাকলেও এ থেকে একটি প্রভাব বিজ্ঞানজগতসহ পুরো মানবসমাজের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

এই প্রতিক্রিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক ফলাফল হলো বস্তুবাদিতা ও শেষ পর্যন্ত নাস্তিকতা। ডারউইনের ধারণাভিত্তিক এই থিওরী মানুষকে বানর বানিয়ে ছাড়ে।

কিন্তু আধুনিক যুগে এসে তাঁর এ ধারণা যে সঠিক ছিলো না তা বিজ্ঞানমহলে দিন দিন পরিস্ফুটিত হয়ে উঠছে।

উনবিংশ শতকে বিজ্ঞানের অপর একটি শাখা- পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে বিজ্ঞানমহলে এক নতুন সাড়া জাগে। এই শাখার উপর গবেষণা ও নতুন নতুন আবিষ্কার ক্ল্যাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানের উপর চরম চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু এসব নতুন থিওরীও বেশীদিন স্থায়িত্ব লাভ করেনি। বিংশ শতাব্দির শুরুতেই বিরাট পরিবর্তন শুরু হয়।

উনবিংশ শতাব্দির শুরুতে প্রথমতঃ নিউটনের আলোকবিজ্ঞানের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। থমাস ইয়াং [১৭৭৭-১৮২৯], অগাস্টিন ফেসনেল [১৭৮৮-১৮২৭] প্রমুখ আলোকের স্বরূপ সম্পর্কে নতুন থিওরী উপস্থাপন করেন। যেখানে নিউটন বলেছিলেন, আলোক সাধারণতঃ প্যাকেট প্যাকেট হিসেবে বিকিরণ হয় সেখানে তারা বললেন, আসলে আলোক হচ্ছে একটি এনার্জি যা মূলত ওয়েভ বা ঢেউ তুলে চলে। অপরদিকে তাপ ও উষ্ণতার উপর মৌলিক থিওরী গড়ে উঠলো। এক্ষেত্রে হারম্যান হেলমোট্জ [১৮২১-১৮৯৪] এর কনজারভেশন অব এনার্জি বা শক্তির অপরিবর্তনীয়তা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "এনার্জি মানুষ সৃষ্টিও করতে পারে না এবং তা ধ্বংস করাও যায় না। শুধুমাত্র প্রযৌক্তিকভাবে তা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রদবদল সম্ভব"। উদাহরণস্বরূপ পানি থেকে প্রাপ্ত এনার্জির কথা তুলে ধরা যায়। একটি হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশনে প্রথমে পানিকে নদীতে বাঁধ দিয়ে আটকে রেখে পটেনশিয়্যাল (সম্ভাব্য) এনার্জি তৈরী করা হয়। এই এনার্জি মূলত- মধ্যাকার্ষণের কারণে সৃষ্ট এনার্জি। পানি মধ্যাকার্ষণের ফলেই উপরের স্তর থেকে নীচের স্তরে গড়িয়ে পড়ে। নদীর বাঁধের মাধ্যমে পানিকে আটকিয়ে রাখার পর এটাকে বিশেষ গেটের মাধ্যমে ছেড়ে দেওয়ার পর পটেনশিয়্যাল এনার্জিকে পরিবর্তন করে কিনেটিক (চলার কারণে সৃষ্ট) এনার্জিতে রূপান্তরিত করা হয়। এই এনার্জি দ্বারা ইলেকট্রিক টারবাইন চালু করে তা আবার মেকানিক্যাল এনার্জিতে পরিবর্তন করা হয়। অর্থাৎ টারবাইনকে ঘুরানো হয়। এখানেই শেষ নয়- মেকানিক্যাল এই এনার্জিকে টারবাইনের মাধ্যমে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি হিসেবে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়। ঘরে পৌঁছার পর এই এনার্জিকে বৈদ্যুতিক লাইট বালব দিয়ে আলোক এনার্জি, প্লাগ দিয়ে

মেকানিক্যাল এনার্জি কিংবা অন্য কোন এনার্জিতে রূপান্তর করা হয়ে থাকে। তাহলে দেখা গেল এনার্জি সৃষ্টি করা হয়নি- বরং পানিতে জামাকৃত স্বাভাবিক পটেনশিয়াল এনার্জি থেকে কৌশলে এসব রদবদল করা হয়েছে। এছাড়া এনার্জি কখনও নষ্ট হয় না। প্রত্যেক এনার্জি দ্বারা কাজ করা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমেও এনার্জি রদবদল হয়। কাজ করার পর যা থাকে তা বায়ূমণ্ডলে চলে যায়। এনার্জির এই বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট হলো, কনজারভেশন অব এনার্জি মানে কি।

তাপ ও উষ্ণতার উপর গবেষণা ছাড়াও মাইকেল ফারাডে [১৭৯১-১৮৬৭] এবং জেমস ক্লার্ক মেক্সওয়েল [১৮৩১-১৮৭৯] প্রমুখ বিজ্ঞানী ইলেকট্রোমেগনেটিজম (বিদ্যুৎ-চুম্বকীয়) এর উপর গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবদান রাখেন। ১৮৯৫ সালে এক্স-রে আবিষ্কারও একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে। এটা আবিষ্কার করেন উইলহেম রয়েজেন [১৮৪৫-১৯২৩]। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে জসেফ জন থমসন [১৮৫৬ -১৯৪০] ইলেকট্রন আবিষ্কার করে আনবিক বিজ্ঞানের সূচনা করেন। এসব মৌলিক আবিষ্কারের ফলেই পরবর্তী বছরগুলোতে বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সাধন শুরু হয়।

প্রাণীবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রে উন্নয়ন

উনবিংশ শতকে শুধুমাত্র পূর্বোল্লিখিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-গবেষণাই চলছিলো না। প্রাণীবিজ্ঞান (বায়োলজি) এবং রসায়ন (কেমিস্ট্রি) শাস্ত্রের উপরও তখন ব্যাপক উৎকর্ষ সাধন হচ্ছিলো। এসময় উন্নতমানের ও শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ বা অণুবিক্ষণযন্ত্রের উন্নয়ন এসব শাস্ত্রে গবেষণায় নতুন উদ্যম যোগান দেয়। এ সময়কার হয়তো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে আবিষ্কারটি ছিলো তাহলো, জৈবিক মৌলিক উপাদান কোষ (সেল) এর পরিচিতি লাভ।

কোষের উপর নতুন বৈপ্লবিক একটি থিওরী থিওডোর শোয়ান [১৮১০-১৮৮২] নামক এক বিজ্ঞানী ১৮৩৯ সালে প্রকাশ করেন। এরপরই খুব দ্রুত কোষের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অংশ বিজ্ঞানীরা সনাক্ত করেন। এছাড়া কোষের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রস্থলে ক্রমোজাম নামক জৈবিক পদার্থ আবিষ্কার করা হয়। প্রাণীবিজ্ঞানীরা গর্ভাশয়ে মানবশিশুর উন্নয়ন নিয়েও গভীর গবেষণা শুরু করেন। বিশেষ করে মহিলাদের ডিম্বকোষ যে পুরুষদের শুক্রের মাধ্যমে ফারটিলাইজ হওয়ার পরই গর্ভাশয়ে ভ্রূণের জন্ম হয়- এ

তথ্যটি সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠে। যদিও মুসলিম বিজ্ঞানীদের অনেকেই এই থিওরী শত শত বছর পূর্বেই উপস্থাপন করেছিলেন।

রসায়ন শাস্ত্রের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতকের শুরুতে স্কুল শিক্ষক জন ডালটন [১৭৬৬-১৮৪৪] কর্তৃক প্রকাশিত এটম থিওরী এখানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই থিওরীর ফলেই কেমিস্টরা এটমের রিলেটিভ (আপেক্ষিক) ওজন কী তা জানতে সক্ষম হন। একই সময় আমেডিও এভোগার্ডো [১৭৭৬-১৮৫৬] নামক এক কেমিস্ট মলিকিউল থিওরী প্রকাশ করেন। এ থিওরীতে বলা হয় একাধিক এটম একসঙ্গে অবস্থান করে একেকটি শক্তিশালী অংশ হিসেবে পদার্থে অবস্থান করে। এসব অংশ হচ্ছে একেকটি মলিকিউল। তবে কেমিক্যাল শাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি আবিষ্কার ছিলো পিরিওডিক টেবিল।

রাশিয়ান কেমিস্ট ডিমিট্রি মেনডেলিয়েভ [১৮৩৪-১৯০৭] হচ্ছেন এর আবিষ্কারক। এই টেবিলের মাধ্যমে একটি সিস্টেমেটিক বা প্রণালীবদ্ধ উপায়ে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ তাদের এটমিক ওজনের ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এই টেবিল থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যাবতীয় পদার্থ বাস্তবে একই উপাদান- এটম থেকে সৃষ্ট। এটমের ওজন [বা এর ভেতরের পরমাণুর (সাব-এটমিক পার্টিকল) সংখ্যা প্রভৃতির] ও অন্যান্য ভিন্নতার ফলে একেকটি একেক ধরণের অবস্থায় অস্তিত্বশীল আছে। জগতের প্রতিটি বস্তুই হয় মৌলিক পদার্থ যাকে বলে ইলেমেন্ট না হয় একাধিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত ধাতু, গ্যাস প্রভৃতি যাকে বলে কমপাউণ্ড। পিরিওডিক টেবিল দ্বারা জানা সব পদার্থের এটমিক অবস্থা বুঝা অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে।

উনবিংশ এবং বিশেষকরে বিংশ শতকে অপর যে উন্নয়ন ঘটে তাহলো, বিজ্ঞানকে একটি প্রফেশন্যাল চেহারায় উপস্থাপন। আগেকার দিনে বিজ্ঞানীরা ছিলেন মূলত পার্টটাইম গবেষক। অনেকেই এ কাজ ছাড়াও অপর কোন কাজে জড়িত থাকতেন। কিন্তু চরম উন্নতি শুরু হওয়ার পর একমাত্র বিজ্ঞান গবেষণার জন্য অনেকে এই কাজকে নিজেদের জিবীকা নির্বাহের উপায় হিসেবে বেছে নেন। অর্থাৎ বিজ্ঞান নিজেই একটি সম্মানিত প্রফেশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই পদক্ষেপের ফলে এক বিরাট দল সৃষ্টি হয় যারা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় একমনে গবেষণা শুরু করেন। এতে বৈজ্ঞানিক উন্নতি দ্রুত থেকে দ্রততর হয়ে ওঠে।

এসময় থেকেই বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের কর্মতৎপরতা এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান (অর্থাৎ প্রযুক্তি) সবার জন্য গৌরবের বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তাছাড়া বিজ্ঞান তখন থেকে কমার্শিয়াল একটি লাভজনক বিষয়ে পরিণত হয়। যে দেশ বা জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে যতো বেশী উন্নত ছিলো সে দেশ বা জাতি ছিলো অর্থনৈতিক দিক থেকে সমুন্নত ও প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী। এই অবস্থা আজও বিদ্যমান। সমগ্র পশ্চিমে এ সময় থেকেই শুরু হয় বৈজ্ঞানিক চরম প্রতিযোগিতা।

বলাই বাহুল্য, এই একই সময় প্রাচ্যের অবস্থা ছিলো এর বিপরিত। যে সময় সমগ্র পশ্চিমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে শিল্পবিপ্লব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলো, ঠিক তখনই পশ্চিমাদের উপনিবেশে জর্জরিত প্রাচ্য আর্থ-রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে যুদ্ধে-বিগ্রহে নিমগ্ন ছিলো। অবশ্য উপনিবেশবাদী পশ্চিমা শক্তি ইচ্ছে করেই সমগ্র প্রাচ্যকে ইন্ডাস্ট্রিয়্যাল রিভুলুশনের প্রভাব থেকে দূরে রাখে। ইচ্ছে করে তাদের শাসিত দেশে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলে নি। কারণ, তারা জানতো প্রাচ্যেও যদি এই বিপ্লব শুরু হয়ে যায় তাহলে নেটিভরা উপনিবেশবাদীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে এবং আর্থ-সামাজিকভাবে প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হবে। পাশ্চাত্য তখন আর সুপেরিয়ার শক্তি হিসেবে টিকে থাকতে পারবে না। সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর অতীতে যেসব মুসলিম জনগোষ্ঠির পূর্বপুরুষরা শত শত বছর চিন্তা-গবেষণা করে গেলেন, সেসব মুসলিম অঞ্চলের মানুষও বৈজ্ঞানিক চেতনা থেকে এ সময় সম্পূর্ণ স্তিমিত হয়ে গেল। তবে এই চেতনা যাতে সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে তাদের পশ্চিমা দখলদার শাসকরা সর্বাত্মক শক্তি তাদের উপর আরোপ করেছিল।

বলাই বাহুল্য আজ উপনিবেশ শেষ হওয়ার প্রায় অর্ধশতক পরেও কিন্তু ঐসব মুসলিম জনপদে বৈজ্ঞানিক চরম চেতনা এখনও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কেরানী সৃষ্টির ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকে পর্যন্ত এখনও উৎখাত করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা চালু হয়নি সেসব দেশে। বৈষয়িক উন্নতি ছাড়া যে এই পৃথিবীতে মর্যাদাসহকারে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়- এই সত্যটি এখনও পোস্ট-উপনিবেশিক স্বাধীন দেশসমূহের হর্তাকর্তারা অনুধাবন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। পূর্ব যুগের মুসলিম বিজ্ঞানীদের স্বপ্ন ছিলো, ইসলামী মহান শরীয়তভিত্তিক সমাজ একটি আদর্শ সমাজ হবে- যদি এর রাজনৈতিক কাঠামো

কুরআন-সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অর্থনৈতিক কাঠামো বিজ্ঞানভিত্তিক গড়ে ওঠে। বাস্তবে তাদের সময়ে এ স্বপ্নের আংশিক বাস্তবতা সমাজে প্রতিফলিত হয়েছিল বলেই ইসলাম ইতিহাসে একাধিক স্বর্ণযুগের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু সে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বিশেষকরে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ছিলো। আধুনিক যুগে এর চরম উন্নতি ইসলামভিত্তিক আরেকটি স্বর্ণযুগ সৃষ্টির পথ উন্মোচন করে দিয়েছে। মুসলিম উম্মাহ এ সত্য যতো তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করবে ততো দ্রুত সবার জন্য তা হবে মঙ্গলময়।

বিংশ শতাব্দির শুরুতে বিজ্ঞান গবেষণার নতুন নতুন দিঘন্ত উন্মোচন হতে থাকে। বিজ্ঞানের অনেক শাখা-প্রশাখা গড়ে উঠে। একেক দল বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানের একেকটি বিষয় নিয়েই গবেষণা শুরু করেন। সুতরাং এ সময় থেকেই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কেমিস্ট, বায়োলজিস্ট, পদার্থবিদ প্রভৃতি প্রফেশন পশ্চিমা সমাজে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এরা একেকজন নিজেদের বিশেষ বিষয়ের উপরই অধ্যয়ন করে কর্মক্ষেত্রে যোগ দেন। এতে সার্বিকভাবে বিজ্ঞানের এক অভাবনীয় চরম উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হয়ে ওঠে। বর্তমানে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রফেশনের সংখ্যা শতাধিক হয়েছে। ভবিষ্যতে তা আরও বাড়তে পারে বলে ধরণা করা হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দির শুরু থেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। থিওরিটিক্যাল বিজ্ঞান ও প্রেকটিক্যাল বিজ্ঞান তথা টেকনোলজির মধ্যে এই বিবাহবন্ধন ছিলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিজ্ঞানের এই প্রধান দু'টি শাখা হয়ে ওঠে একে অন্যের সম্পূরক। বিজ্ঞানের থিওরীকে কাজে লাগায় টেকনোলজি, অপরদিকে টেকনোলজি বিজ্ঞানের গবেষণা উন্নতর করতে উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির যোগান দেয়। বিংশ শতাব্দির শুরুতে এই দুটোর মধ্যে সম্পর্ক এতো গভীর হয় যে, একটা অপরটির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিজ্ঞানীদের অর্থিকভাবে সহযোগিতা করে, যার ফলে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও মেশিন আসতে থাকে বাজারে সাধারণ্যের জন্য। মেডিক্যাল সাইন্সের ক্ষেত্রে বিরাট বিরাট ফার্মিসিউটিক্যাল কোম্পানীর আবির্ভাব ঘটে। এসব কোম্পানী ঔষধ তৈরীর জন্য মেডিক্যাল

বিজ্ঞানীদের বিরাট অঙ্কের টাকা দিতে থাকে। এভাবে সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব দ্রুত টেকনোলজিক্যালী বা প্রযৌক্তিকভাবে উন্নততর সমাজে রূপান্তরিত হয়।

বিংশ শতাব্দির বিজ্ঞান

গেল শতক অর্থাৎ বিংশ শতাব্দির বৈজ্ঞানিক চরম উন্নতির যুগকে আমরা কিভাবে অনুধাবন করতে পারি- তা একটি জটিল প্রশ্ন বটে। একটু ব্যাপকভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, এসময় বাস্তবে সমগ্র বিজ্ঞানজগৎ একটি শিল্পে পরিণত হয়েছিল। এই শিল্পে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসংখ্য মানুষ জড়িত হয়ে এমন একটি আর্থ-সামাজিক-বৈজ্ঞানিক বিপ্লব শুরু করে, যা অতীতে মানবেতিহাসে আমরা কোন সময়ই দেখি নি। বৈষয়িক দিক থেকে এই বিপ্লবের প্রভাব ছিলো অপরিসীম। আর বাস্তবে এই বিপ্লব এখনও চলছে। একবিংশ শতকে এটা আরও গতিশীল হচ্ছে বলেই প্রাথমিক বছরগুলো প্রমাণ করেছে। অনেকে বিংশ শতককে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য ইতিহাসের মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এক তথ্যানুযায়ী গত শতকের শেষের দিকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মাত্রা প্রতি ১৫ বছরে দিগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। এছাড়া বিংশ শতাব্দির গবেষণাও ছিলো আগের সব শতাব্দির তুলনায় অনেকটা ভিন্ন ধরণের। শতাব্দির শুরুতে পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বাস্তবে এক নবতর বিপ্লব শুরু করেন। এদের মধ্যে প্রথমেই আমাদেরকে ম্যাক্স প্লাংকের কথা স্মরণ করতে হয়।

১৯০০ সালে ম্যাক্স প্লাংক [১৮৫৮-১৯৪৭] তাঁর বৈপ্লবিক থিওরী 'কুয়ান্টাম মেকানিক্স' প্রকাশ করে বিজ্ঞানজগতে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এর মূলে হচ্ছে বস্তু থেকে এনার্জি বিকিরণের স্বরূপ। ইতোমধ্যে সবাই মেনে নিয়েছিলেন যে, এনার্জি বিরিকণ হয় একটানাভাবে (কন্টিনিউয়াসলি)। কিন্তু প্লাংক বললেন, বাস্তবে তা একেকটি প্যাকেট বা কোয়ান্টা-এর মাধ্যমে বিকিরণ হয়। এ মুহূর্তে এই থিওরীর গুরুত্ব আমরা অনুধাবন করতে না পারলেও এটা যে আনবিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিরূপ প্রবাভশালী ছিলো তা দ্বিতীয় খন্ডে আমরা জানতে পারবো।

কেয়ান্টাম মেকানিস্ক থিওরী আসে জে জে থমসন [১৮৫৬-১৯৪০] কর্তৃক ইলেকট্রন আবিষ্কারের মাত্র তিন বছর পর। প্লাংকের থিওরী যেরূপ বিপ্লবী ছিলো তার চেয়েও বৃহৎ এবং সুদূরপ্রসারী আরেকটি বিপ্লব মাত্র ক'বছরে মধ্যেই প্রকাশিত হতে যাচ্ছিলো। সে বিপ্লবটি ছিলো আলবার্ট আইনস্টাইনের [১৮৭৯-১৯৫৫] আপেক্ষিকতাবাদ।

দু'টি ভিন্ন থিওরীর মাধ্যমে তিনি আপেক্ষিকতাবাদের উপস্থাপন করেন। ১৯০৫ সালে প্রথমে প্রকাশ করেন বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ। এতে বলা হয়: সব ফিজিক্যাল আইন পর্যবেক্ষক ব্যক্তির জন্য আপেক্ষিক এবং সকল পর্যবেক্ষকের ক্ষেত্রেই- সে স্থির অবস্থায় থাকুক কিংবা চলন্ত থাকুক, আলোকের গতি সর্বাবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে। সুতারাং এই একটি মাত্র বাক্যের মাধ্যমে নিউটনের 'মোশন্স অব এবস্যুলুট স্পেইস এন্ড টাইম' [চুড়ান্ত স্থান-কালের গতিবিধি] থিওরী উড়ে যায়।

সময় ও স্থান আইনস্টাইনের মতে আপেক্ষিক এবং একটা আরেকটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কোন চূড়ান্ত ঘড়ি বা স্থান এ মহাবিশ্বে নেই। পর্যবেক্ষক হিসেবে সময় ও স্থান আমাদের অবস্থান ও গতির উপর ভিত্তিকরে আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করে। একই ঘটনা বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে দেখবে। এছাড়া আইনস্টাইন তাঁর প্রখ্যাত সমীকরণ ই=এমসিস্কোয়ার্ড দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন যে, ওজন (মেস) ও এনার্জির (উদ্যম) মধ্যে এটাই সম্পর্ক।

এই থিওরীর ১০ বছর পর ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন আপেক্ষিকতাবাদের দ্বিতীয় থিওরী প্রকাশ করেন। এটাকে তিনি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ নামকরণ করেছেন। আইনস্টাইনের এই থিওরীদ্বয় সম্পর্কে পরবর্তী খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা হবে। বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক দিক আলোচনায় এগুলোর কথা এখানে সংগত করণেই উল্লেখ করা হল।

বিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে অপর যে বৈপ্লবিক থিওরী প্রকাশিত হয় তা শুধু বিজ্ঞানজগতকে নয় দর্শন শস্ত্রের উপরও বিরাট প্রভাব ফেলে। এ থিওরীর নাম হলো অনিশ্চয়তাবাদ। হেইজেনবার্গ [] নামক এক বিজ্ঞানী এই থিওরীর উদ্ভাবক। ১৯২৭ সালে তিনি এই থিওরী প্রকাশ করেন। বস্তুজগতের মৌলিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ অণু-পরমাণুর জগতে প্রাকৃতিক আইন যেন খামখেয়ালীভাবে কাজ করে। এই

থিওরীর এটাই বৈশিষ্ট্য। এ থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অণু-পরমাণু বাস্তবে কোন অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে তাদের নিজের আইনকে ভঙ্গ করে ফেলে। তবে এই থিওরী প্রথমতঃ বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতে পারেননি বা চাননি। কারণ, তখন প্রায় সকলেই চরম বস্তুবাদী দর্শনের প্রভাবে পড়ে নাস্তিক্যবাদী হয়ে গিয়েছিলেন। এই থিওরীর মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদের উপর কুঠারাঘাত পড়ে। অনেক বিজ্ঞানী হেইজেনবার্গের থিওরীকে উড়িয়ে দিলেন। প্রভুবিশ্বাসী বলে খ্যাত স্বয়ং আইনষ্টাইনও তা গ্রহণ করতে না পেরে একদা বলেছিলেন, "ঈশ্বর স্বভাবকে নিয়ে পাশা খেলেন না!" কিন্তু গণিতশাস্ত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হেইজেনবার্গের শক্তিশালী এই থিওরীকে উড়িয়ে দিতে কেউই সমর্থ হননি। আইনষ্টাইন হেইজেনবার্গের থিওরীকে ভুল প্রমাণিত করতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

বিংশ শতকে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বিশ্বতত্ত্ব

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বিশ্বতত্ত্বে শতাব্দির দ্বিতীয় দশকে আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডইউন হাবলের [১৮৮৯-১৯৫৩] গবেষণা বিশেষ ভূমিকা রাখে। ইতোপূর্বে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে যেসব ধারণা ছিলো হাবল তা পাল্টে দেন। তিনি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, এ মহাবিশ্বে শুধু অসংখ্য তারাজগৎ তথা গ্যালাক্সি বিদ্যমান নয় বরং এসব সর্বদাই চতুর্দিকে বিস্তারলাভ করছে। হাবল অঙ্ক কষে আবিষ্কার করেন, গ্যালাক্সির দূরত্বের সঙ্গে এর দূরে সরে যাওয়ার গতি সম্পর্কিত আছে। এই আবিষ্কার থেকে বিজ্ঞান মহলে জগতকে আরও সঠিকভাবে জানার এক নবতর সাড়া জাগে। বিশেষকরে হাবলের সমীকরণের গতিটি যদি বিপরিত দিকে চালানো হয় তাহলে বিশ্বের বয়স সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে বলে অনেক বিজ্ঞানী মতামত পোষণ করেন। এই উপায়ে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো, এ মহাবিশ্ব আজ থেকে ১৪ বিলিয়ন বছর পূর্বে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বাংলায় এ সংখ্যাটি হচ্ছে ১৪ হাজার কোটি বছর। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের উপর লিখিত পরবর্তী খণ্ডে বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। সুতরাং এ প্রসঙ্গে এতটুকু বলাই যথেষ্ট।

পৃথিবী নিয়ে গবেষণা

বিংশ শতাব্দির শরুতে পৃথিবী সম্পর্কে গবেষণায় আলফ্রেড লোথার ওয়েগনার [১৮৮০-১৯৩০] নামক এক ভূতত্ত্ববিদ একটি গুরুত্বপূর্ণ থিওরী প্রকাশ করেন। ১৯১০ সালে প্রকাশিত এই থিওরীর নাম হচ্ছে কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্‌ট বা চলমান মহাদেশ। এই থিওরী অনুযায়ী, ২০০ মিলিয়ন বছর পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর ভূখণ্ড একত্রে ছিলো। এই মহা-মহাদেশ পরে ভেঙ্গে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রতিটি খণ্ড ধীরে ধীরে একে অন্যের নিকট থেকে দূরে সরে গিয়ে আজকের একাধিক ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছে। ওয়েগনারের এই থিওরী গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এর পরীক্ষিত কোন প্রমাণ উপস্থান করতে ব্যর্থ হন। তবে ৩০ এর দশকে পরীক্ষাভিত্তিক প্লেট টেকটনিক্স নামক অপর একটি থিওরী গড়ে ওঠে। এই থিওরীর মাধ্যমে ওয়েগনারের থিওরীর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

চলমান তথ্যবিপ্লব

বিংশ শতকের শেষার্ধে ‘ইনফরমেশন রিভোলুশন’ বা তথ্যবিপ্লব শুরু হয় এবং তা আজো দ্রুত গতিতে চলমান আছে। এ বিপ্লবের সঙ্গে ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি জড়িত।

প্রিন্টেড ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে পুরো বিশ্বব্যাপী ঘরে ঘরে ইনফরমেশন পৌঁছে দেওয়ার বৈপ্লবিক এই পদক্ষেপ থেকে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ বিশ্বসমাজ সম্পর্কে অনেক বেশী ওয়াকিবহাল হবে- এটাই এর সফলতা। ইতোমধ্যে ‘কম্পিউটার’ প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য উন্নয়নের ফলে জগতব্যাপী ‘শিক্ষাবিপ্লব’ বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। আধুনিক তথ্যবিনিময় প্রযুক্তি ‘ইন্টারনেট’ এর মাধ্যমে একটি ‘মাউসক্লিক’ দ্বারা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত যোগাগোগ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। ইন্টারনেট নামক এই অভিনব তথ্যবিনিময় নেটওয়ার্কটি মানবসভ্যতার জন্য সার্বিকভাবে উপকার না অপকার বয়ে আনবে তা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলে দিতে পারে। তাবে, চিন্তার কারণ আছে অবশ্যই।

ইন্টারনেটে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-সমাজ পিরিচিতি, ইতিহাস, প্রিন্টেড মিডিয়াসহ, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাকার অসংখ্য শিক্ষামূলক তথ্যাদি বিদ্যমান, তেমনি এতে কিছু অসাধু, বেতমিজ, শয়তানচক্র একদল লোক অসংখ্য অশ্লীল উলঙ্গ ছবি, ফিল্ম, গল্প ইত্যাদি প্রচার করছে। এর ফলে নিয়ন্ত্রণহীন ইন্টারনেট নতুন প্রজন্মের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। সহজে প্রাপ্য এসব অশ্লীলতার প্রভাব থেকে এরা মুক্ত থাকতে পারছে না।

সুতরাং তথ্যবিপ্লবের এই আধুনিক যুগ নীতি-নৈতিকতা, লজ্জাশীলতা, একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ইত্যাদি মানবিক মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীকে সমূলে ধ্বংসের এক মারাত্মক প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। এ থেকে বাঁচার উপায়-অবলম্বন যে কোন মূল্যে খুঁজে বের করতে হবে।

আজকাল ইন্টারনেট আর কারো ব্যক্তিগত প্রযুক্তি বা সম্পদও নয়। এতে যেসব তথ্যাদি 'আপলোড' [তুলে দেওয়া] হচ্ছে তা কে কোন্ দেশ থেকে কিভাবে দিচ্ছে তা চিহ্নিত করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর ফলে 'নেটদস্যুদের'-কে সমুচিত শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং, বিশ্বের সকল মানুষের সম্পদ ও প্রযুক্তি এই ইন্টারনেটকে আন্তর্জাতিকভাবে সরকারসমূহের যৌথ উদ্যোগে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ খোলা নেই। অবশ্য সফট্ওয়ার [কম্পিউটার ও ইন্টারনেট চালু রাখার টেকনিক্যাল প্রোগ্রামকে বলে সফটওয়ার।] কোম্পানীগুলো ইতোমধ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বটে। কিন্তু শুধুমাত্র টেকনিক্যাল উপায়ে এই সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব নয়।

সুতরাং আন্তর্জাতিকভাবে সরকারসমূহের যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে ইন্টারনেট থেকে 'অশ্লীলতা' নির্মূল করতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যৎ বংশধরদের মন-মানসিকতায় মারাত্মক প্রভাব পড়বে যা থেকে পুরো বিশ্ব অভাবনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। বিশ্বের প্রতিটি শহরে আকজাল গজিয়ে উঠছে 'ইন্টারনেট ক্যাফে'। এসব দোকানে শিশু-কিশোররা পর্যন্ত নিয়মিত কাস্টমার। অভিভাবকদেরকে সচেতন করাও সবার দায়িত্ব। হোমওয়ার্ক করার ভান করে ছেলে-মেয়েরা ইন্টারনেট ক্যাফেতে গিয়ে কি করছে তার একটু খোঁজ-খবর রাখা

দরকার। আর এসব 'ক্যাফে' সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রণ- এমনকি প্রয়োজনে এ ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণার কথাও বিবেচনা করতে হবে।

এ খণ্ডের শেষ কথা

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ইতিহাস গবেষণায় আমরা এখানে এসেই থেমে যাচ্ছি। তবে বিংশ শতাব্দিব্যাপী এবং একবিংশ শতকের শুরু পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ অব্যাহত ছিলো। আর তা ভবিষ্যতেও থাকবে। গেল শতাব্দিতে বস্তুবিজ্ঞান ও টেকনোলজির ক্ষেত্রেও অবিশ্বাস্য উন্নতি হয়েছে। এটমিক এনার্জি ও এটম বোমা থেকে হাইটেক কম্পিউটার হচ্ছে এর উদাহরণ। এসব দিক নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান খণ্ডে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুতরাং এগুলোর ইতিহাস ও উন্নয়ন সম্পর্কে আর বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। তবে একটা জিনিষ মনে রাখা উচিত, আজকাল বিজ্ঞানের উন্নয়ন এতো দ্রুত ঘটছে যে, একটি বইয়ে আপ-টু-ডেট সবকিছু লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব।

সুতরাং পরবর্তী খণ্ডে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি 'আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের' পুরো উপস্থাপন নয়। এ সত্যটির স্বীকারোক্তির মাধ্যমে পাঠকদের কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কারণ, পুরো তথ্যাদি তুলে ধরা সম্ভাবনার বাইরে। শুধুমাত্র মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির উপরই সরল ভাষায় সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপনের চেষ্টা চালিয়েছি।